৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন

স্মরণিকা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সম্মেলন স্মরণিকা
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

প্রকাশকাল
৩০ মার্চ ২০১৬

সম্পাদনা
প্রচার ও প্রকাশনা উপপরিষদ
চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

মুদ্রণ
কল্পক
৩৪৩/বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা- ১০০০
মোবাইল : ০১১৯৯-৮৩৮৯১০।

যোগাযোগ
২২/১, বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
তোপখানা রোড, ঢাকা -১০০০
ফোন : ৯৫৭৬৩৭৩; ০১৯১২-০০২৩১৯
ই-মেইল : studentfront1984@gmail.com

শুভেচ্ছা মুল্য
৫০ টাকা

উৎসর্গ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড কৃষ্ণ কমল, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অকুতোভয় বিপ্লবী সৈনিক বিনোদ বিহারী চৌধুরী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে...

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় -৪
- ৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি - ২০১৬ -৫
- পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কমিটি -৬
- সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়কের বক্তব্য -৭
- অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র শুভেচ্ছাবার্তা -৮
- সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট -১০
- পেশা নির্বাচন সম্পর্কে একজন তরুণের চিন্তা- কার্ল মার্কস -১৩
- যুব সমাজের কর্তব্য - লেনিন -১৫
- ছাত্র ও যুবসমাজের কর্তব্য - শিবদাস ঘোষ -১৭
- সামাজিক প্রয়োজনের জন্য যদি শিক্ষা হয়, তাহলে এই প্রয়োজন ধারণ করা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ হওয়া অসম্ভব - কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী -২০
- হৃদয়ে শিক্ষা চাই - সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী -২৩
- তরুণের বিদ্রোহ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -২৬
- ভিক্ষা দাও - কাজী নজরুল ইসলাম -২৯
- প্রতিটি বিপ্লবীর ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম ও বিজয় বিপ্লবী সংগ্রামের অমূল্য সম্পদ - ভগৎ সিং -৩০
- তোমাদের জন্য রেখে গেলাম একটি সোনালী স্বপ্ন - সূর্য সেন -৩১

সম্পাদকীয়

বাণিজ্য ও মুনাফার চক্রে আবর্তিত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ডিগ্রিধারীর সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও সমাজে মানবিকতা-মূল্যবোধের অবশেষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'উন্নয়ন'র মুখরোচক বুলির আড়ালে চাপা পড়ছে অধিকারহারা মানুষের আর্তনাদ। শাসকদের নানা পরিকল্পনা-নীতি যখন মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়, তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েই শুভবোধের উদ্বোধন হয়, সমাজ-সভ্যতা এগিয়ে যায়। ইতিহাস আমাদের শেখায় অন্যায়-অসঙ্গত কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুঃশাসন-দুর্নীতির পঙ্কে সমাজ যতই নিমজ্জিত হোক, দেশের ছাত্র-যুবসমাজ যদি ঘুরে দাঁড়ায়, কোনো দুঃসহ ভারই টিকে থাকতে পারে না। সময়ের এ প্রয়োজনকে ধারণ করে এগিয়ে আসার জন্য আমরা সমগ্র ছাত্রসমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

সারা দেশের স্কুলগুলোতে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন বৃদ্ধির ফলে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা চালু শিক্ষার মানের অবনমনই কেবল ঘটায়নি, শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মানসিক চাপ ও হয়রানি বাড়িয়েছে। পাশাপাশি কোচিং ও গাইড বইয়ের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে খরচ বেড়েছে বহুগুণ। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পাসের হার বাড়িয়ে দেখানোর ফলে দুর্নীতি পাকাপোক্ত আসন গেড়েছে। শিশুদের খেলাধুলা ও সুস্থ বিনোদনের কোনো অবকাশই নেই। মাধ্যমিক স্তরেও একদিকে পরিকাঠামো নেই, অন্যদিকে রয়েছে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত শিক্ষকের অভাব। এসব ঘাটতি দূর না করে চালু হওয়া সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সৃজনশীলতা বাড়ায়নি, বহুগুণে বাড়িয়েছে কোচিং ও গাইডের ব্যবসা।

জ্ঞান বিতরণ নয়, কেবল পরীক্ষা নেবার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহ। শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, হল-সেমিনারসহ সামগ্রিক আয়োজন তৈরিতে অবহেলা এ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। চাহিদা অনুসারে অর্থ বরাদ্দ না দেবার ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে ধুঁকে ধুঁকে। 'ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানোর জন্য বেতন-ফি বৃদ্ধি, পরিবহন ও হলসমূহে ভর্তুকি কমানো, বাণিজ্যিক নাইটকোর্স চালু ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর অর্থায়নে চালাতে হবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। গত দুই দশকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেড়েছে হাতে গোনা, বিপরীতে প্রাইভেট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে বহুগুণ। সন্ত্রাস দখলদারিত্ব কায়েম ও পরিকল্পিতভাবে ছাত্রসংসদ নির্বাচন বন্ধ করে রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

এতসব সংকট থাকার পরও দেশে কার্যকরী কোনো ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠছেনা অনেকদিন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চরম ফ্যাসিবাদী শাসন চলছে দেশে। বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তি পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ- এগুলো আজ জাদুঘরে। পুরোপুরি পুলিশি নিয়ন্ত্রণে চলছে রাষ্ট্র। প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খুন, ধর্ষণ, শিশু হত্যা ইত্যাদি অমানবিক, বর্বর কর্মকাণ্ড। দাম দিয়ে কেনা বাংলা এখন যেন এক লাশের দেশ। চরম ফ্যাসিবাদী স্বেচ্ছাচারী দাপটে '৫২, '৬২, '৬৯, '৭১ এর সেই লড়াকু ছাত্রযুবকদের দেশ আজ দিশাহীন।

দেশের পাঁচ শতাংশ মানুষ আজ পঁচাশি শতাংশ সম্পদের মালিক। তারাই এ সরকারকে অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। বড় বড় কর্পোরেট গ্রুপগুলো মিলে ঠিক করছে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে। পুঁজিবাদী এ ব্যবস্থা সমস্ত সংকটের জন্ম দিচ্ছে, শিক্ষার সংকট এর বাইরের কিছু নয়।

আজ এই বন্ধ্যা ও বন্দীদশা থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব ছাত্রদেরই। চতুর্থ সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংগঠন লড়াই-সংগ্রামের সেই উন্নত চরিত্র সৃষ্টির সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

শুভেচ্ছাসহ

প্রকাশনা উপপরিষদ, চতুর্থ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি - ২০১৬

আহ্বায়ক : নাঈমা খালেদ মনিকা

সদস্য সচিব : স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু

দপ্তর উপকমিটি : আহ্বায়ক - জয়দ্বীপ ভট্টাচার্য। সদস্য : সেঁজুতি চৌধুরী, আশরাফ মিল্টন, নয়ন দাশ, শুভ সাহা, লিপন আহমেদ, জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী, রাসেল সরদার, আমেনা নিতু

অর্থ উপকমিটি : আহ্বায়ক - মলয় সরকার। সদস্য : মেহরাব আজাদ, রেহেনা চৌধুরী, তিথি চক্রবর্তী, তৌফিকা দেওয়ান লিজা

প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি : আহ্বায়ক – রাশেদ শাহরিয়ার। সদস্য - তাজনাহার রিপন, বিটুল তালুকদার, মিশু দত্ত, রাফিকুজ্জামান ফরিদ, সাদিকুল ইসলাম, নাজমুল ইসলাম সাদ্দাম, ধীমান কুণ্ডু

খাদ্য উপকমিটি : আহ্বায়ক- কল্যাণ দত্ত। সদস্য- ভজন বিশ্বাস, গোলাম রাব্বী, পীযূষ রায়, অরূপ দাস শ্যাম, নিখিল চন্দ্র নাথ

অভ্যর্থনা উপকমিটি : আহ্বায়ক : ইভা মজুমদার। সদস্য- আরিফ মঈনুদ্দিন, রুবাইয়াৎ আহমেদ রুবা, সঞ্জয় কান্ত দাস, জাকিয়া সুলতানা জ্যোতি, আইরিন সুলতানা মিথুন, পিয়াস দাশ

র‍্যালি ও শৃঙ্খলা উপকমিটি : আহ্বায়ক : সত্যজিৎ বিশ্বাস। সদস্য- আহসানুল আরেফিন তিতু, মাসুদ রেজা, শফিকুল ইসলাম, নীলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, মনিরুজ্জামান মনির, মুক্তা ভট্টাচার্য, রুহুল আমিন, তাজিউল ইসলাম, কলিন চাকমা, প্রবাল মজুমদার, রেজাউর রহমান রানা, শীতল সাহা, রায়হান বকসী, রহিমা আক্তার কলি, শামীম আরা মিনা, বিপ্লব চৌধুরী, দীপা মজুমদার, কাজী জহির উদ্দিন, কিশোর কুমার সরকার।

ব্যবস্থাপনা উপকমিটি : আহ্বায়ক : মাসুদ রানা। সদস্য- রোকনুজ্জামান রোকন, সাইফুল হাসান মুনাকাত, সালমান সিদ্দিকী, মোবারক করিম, চন্দন সরকার, বজলুর রহমান, কৃষ্ণ বর্মণ, খোকন মহন্ত, লুবাইনা আন্নি, অনিমেশ রায়, যুন্‌নুন হাসান খান, স্মরণ বিশ্বাস

সাংস্কৃতিক উপকমিটি : আহ্বায়ক: সুস্মিতা রায় সুপ্তি। সদস্য- সবিতা সরকার, গোবিন্দ দাস, সমিত ভৌমিক, তীর্থরাজ বিশ্বাস

সাজসজ্জা উপকমিটি : আহ্বায়ক– শরীফুল চৌধুরী। সদস্য- প্রগতি বর্মন তমা, ছায়েদুল হক নিশান, প্রসেনজিৎ সরকার, অনিক ধর, প্রসেনজিৎ রুদ্র, সায়মা আফরোজ

পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কমিটি (২৩ অক্টোবর ২০১৩- ৩০ মার্চ ২০১৬)

সভাপতি : সাইফুজ্জামান সাকন

সহসভাপতি : কল্যাণ দত্ত

সাধারণ সম্পাদক : স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু

সাংগঠনিক সম্পাদক : সত্যজিৎ বিশ্বাস

দপ্তর সম্পাদক : শরীফুল চৌধুরী

অর্থ সম্পাদক : মলয় সরকার

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : রাশেদ শাহরিয়ার

শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক : সেঁজুতি চৌধুরী

স্কুল বিষয়ক সম্পাদক : তাজ নাহার রিপন

সদস্য

১. নাঈমা খালেদ মনিকা

২. আহসানুল আরেফিন তিতু

৩. নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী

৪. মাসুদ রেজা

৫. শফিকুল ইসলাম

৬. মুক্তা ভট্টাচার্য

৭. মনিরুজ্জামান মনির

৮. জয়দীপ ভট্টাচার্য

৯. রুহুল আমিন

১০. মাসুদ রানা

১১. তাজিউল ইসলাম

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়কের বক্তব্য

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে বিপ্লবী অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রণীত কোনো শিক্ষানীতিতে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃত হয়নি। লর্ড মেকলের কেরানি তৈরির শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর। পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতির বিরোধিতা করেছিল ছাত্র-জনতা। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার অপূরিত থেকেছে। বরং '৯০ পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসারের কারণে শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সেবাখাতসমূহের ব্যাপক বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। বাংলাদেশেও এর অংশ।

শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারকে সমুন্নত রাখতে অতীত যুগের বড় মানুষের উত্তরসূরী হিসেবে ১৯৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমাদের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সে লড়াই যেন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে সংস্কৃতি-মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। পুঁজিবাদসৃষ্ট ভোগবাদ মানুষকে ক্রমাগত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন করছে, সবকিছুকে লাভ-লোকসানের সাথে সম্পর্কিত করছে। একদিন নজরুল বলেছিলেন, "দাসত্ব গোলামী ছাড়িয়া দিলে খাইব কি করিয়া? কি নীচ প্রশ্ন! যেন আমাদের শুধু কুকুর বিড়ালের উদর পূর্ত্তির জন্যই জন্ম।" তাই নজরুলের মতো মনীষীদের ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ দেশ সূর্য সেনের দেশ, যে সূয সেন মৃত্যুর আগে তরুণদের আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশের কাজে ব্রতী হবার। কিন্তু আজ তরুণরা সূর্য সেনকে চেনে না। চিনতে দেয়া হয় না। যে সব চরিত্র মানুষকে সামাজিক করে, বড় মানুষ হবার প্রেরণা জোগায়, শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁদের তুলে ধরা হয় না। বরং স্কুল থেকেই নানাভাবে ছাঁচে ঢালা মানুষ বানানোর চেষ্টা করা হয়।

আজ অবস্থা এমন, রাজনীতির কথা শুনলে ছাত্ররা পিছিয়ে যায়। বুর্জোয়া সংগঠনের আদর্শবর্জিত রাজনীতিই এ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সত্য-ন্যায়ের ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সারাদেশের ছাত্র-জনতার সমর্থন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সম্মেলনেও শিক্ষক-অভিভাবক-শ্রমজীবী জনসাধারণের ব্যাপক নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। এটাই আমাদের শক্তির জায়গা।

আজ যারা আমাদের এই সম্মেলনে এসেছেন তাদের সবাইকে আহ্বান করছি, শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনারা সাহসের সাথে এগিয়ে আসুন। সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, একই পদ্ধতির, গণতান্ত্রিক শিক্ষার যে লড়াই আমরা করছি তাতে শামিল হোন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এই নিস্তরঙ্গ সময়ে জনগণের আশা-ভরসার প্রতীক হিসেবে লড়ছে। একে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা।

নাঈমা খালেদ মনিকা
আহ্বায়ক
চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট-এর চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র শুভেচ্ছাবার্তা

বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (এসএসএফ)-এর চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন এমন একটা সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্বের দেশে দেশে একদিকে শিক্ষা ও ছাত্র সমাজের উপর শাসকশ্রেণীর লাগাতার আক্রমণ নেমে আসছে, অন্য দিকে তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ছাত্র তথা গণবিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে। এই তাৎপর্য্যপূর্ণ মুহূর্তে আয়োজিত এস এস এফ-এর সম্মেলন উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতা, কর্মী, সংগঠকদের উদ্দেশ্যে ভারতের ছাত্রসমাজ এবং আমাদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট্স অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

আপনাদের সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ও দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রাম পরিচালনা করছে তার প্রতি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র হাজার হাজার কর্মী এবং কয়েক লক্ষ সদস্য প্রত্যেকেই গভীর আবেগ ও একাত্মতা বোধ করে।

আমাদের সংগঠন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করার আন্দোলন শুধু দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষা অর্জন কিংবা ভবিষ্যৎ জীবিকার দাবীতে অর্থনৈতিক আন্দোলন নয়, বরঞ্চ শেষ বিচারে তা সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ইতিহাস নির্ধারিত এই সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ দুই প্রতিবেশী দেশের দুই সংগঠনের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান আমাদের সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনে প্রতিনিধি দল পাঠানোর জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ আমরা সানন্দে গ্রহণ করছি এবং আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভারতের শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলন বর্তমানে এক জটিল ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাজারের অঙ্গ হয়ে ওঠায় শিক্ষাক্ষেত্র আজ পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, প্রতারণা আর লুটপাটের লীলাভূমি হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ধর্মীয় অন্ধতা, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, ক্রমবর্ধমান হিংসা শিক্ষাঙ্গণকে কলুষিত করছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে সার্বজনীন শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর বাক্য ব্যয়, আইন প্রণয়ন, একের পর এক কমিশন গঠন ইত্যাদির অভাব হয়নি। কিন্তু মুখে যাই বলা হোক, ঝান্ডার রঙ বা শ্লোগানে যাই পার্থক্য থাকুক না কেন প্রত্যেকটি সরকারের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপই শেষ পযন্ত শিক্ষাকে সরাসরি কিংবা কৌশলে সংকুচিত করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। পদদলিত করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির পরিপূরক 'ম্যান মেকিং ক্যারেক্টার বিল্ডিংয়ের' আদর্শকে। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে আনা, আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম চালু করে সকল উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, বিপুল পরিমাণ শূণ্য পদে শিক্ষক নিয়োগ না করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে চরম উদাসীনতা প্রদর্শনই সরকারী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার শিক্ষায় সরকারী দায়িত্ব সরাসরি অস্বীকার করে এবং শিক্ষাকে বিনিয়োগের লোভনীয় ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে। পরবর্তীকালে বিজেপি পরিচালিত প্রথম এনডিএ জোট সরকার দেশের দুই জন একচেটিয়া পুঁজির মালিককে নিয়ে আম্বানী-বিড়লা শিক্ষা কমিশন গঠন করে। সেই কমিশন সর্বোচ্চ মুনাফা লুণ্ঠনের অপরিহার্য নিয়মে চরম মন্দা এবং উদ্বৃত্ত পুঁজির সমস্যায় জর্জরিত এবং নুতন বাজারের সন্ধানে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী

বিশ্বায়ন তথা বাজার অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে বিনিয়োগ ও মুনাফা লুণ্ঠনের ক্ষেত্র রূপে শিক্ষাক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করে।

এই পরিকল্পনার প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, জনসাধারণের রাজস্বের অর্থে সরকার পরিচালিত সকলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাকে যেকোনও মূল্যে বন্ধ করা। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফি-বৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমান করে দেওয়া যাতে জরাজীর্ণ সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে শিক্ষাবাজারের ক্রেতারা আপাত ঝাঁ চকচকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেই বেছে নেয়। একে তারা বলছে লেভেল পেয়িং ফিল্ড তৈরী করা। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র সংগঠিত লাগাতার আন্দোলনের ফলে যথেচ্ছ ফি-বৃদ্ধি করা সম্ভব না হওয়ায় তারা নানা কৌশল গ্রহণ করছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত তথাকথিত Right to Education Act বা শিক্ষার অধিকার আইন। এই আইনের নামে তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। তাদের যুক্তি, এতে নাকি স্কুল ছুট কমবে। এক্ষেত্রেও সারা দেশে একমাত্র অল ইন্ডিয়া ডিএসও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে যে, পাশফেলের সাথে স্কুল ছুটের কোনও সম্পর্ক নেই, দারিদ্র্যই ঐ সমস্যার একমাত্র কারণ। এআইডিএসও বলেছে, পাশফেল তুলে দেওয়ার ফলে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা অর্থহীন এবং অকার্যকরী হয়ে পড়বে। সরকারী স্কুলে পড়তে বাধ্য হওয়া দরিদ্র এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা কিছুই শিখবে না। কিছু না শিখেই তাদের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাবে। শিক্ষার অধিকারের নামে সারা দেশের মানুষের বেদনাদায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আশঙ্কাকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। ভয়াবহভাবে বাড়ছে স্কুলছুট। উঠে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ সরকারী স্কুল। শিক্ষাক্ষেত্র আজ লুঠের বাজারে পরিণত।

শিক্ষার উপর দ্বিতীয় আক্রমণটি আরও ভয়ঙ্কর। তা হল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার মর্মবস্তুকে বিকৃত করে দেওয়া। অর্থের বিনিময়ে যারা শিক্ষার সুযোগটি ক্রয় করতে পারছে তাদের মধ্যে যাতে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনন, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মন না গড়ে ওঠে সেই কারণে স্কুল-স্তরে যৌনশিক্ষা প্রবর্তন করা, সাহিত্যকে পাঠ্যসূচীতে গুরুত্বহীন করে দেওয়া, কুসংস্কার ধর্মীয় অন্ধতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার মত মানবতা-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশপ্রেমের নামে মাথা তুলছে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ। সারা দেশে আক্রান্ত এমনকি নিহত হচ্ছেন একের পর এক মুক্ত চিন্তার মানুষ।

শিক্ষার পুনর্গঠনের নামে এইসব পদক্ষেপের অন্তরালে যে পরিকল্পিত হিংস্র আক্রমণ লুকিয়ে আছে তা প্রকৃতপক্ষে সমাজের মধ্যে তীব্র শ্রেণী সংঘর্ষকেই সূচিত করে। আমরা জানি বহু বিষয়ে আপনারাও একই রকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এই আক্রমণের গভীরতাকে উপলব্ধি করা কিংবা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা কার্যত অসম্ভব। বৈপ্লবিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠনই সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। একথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে আমরা গৌরব বোধ করি যে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতাদর্শগত সেই অমোঘ হাতিয়ারটি আমাদের আছে। আছে সমস্ত ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তি ও আক্রমণকে পরাস্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন সহ

কমল সাঁই
সভাপতি

অশোক মিশ্র
সাধারণ সম্পাদক

অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট্স অর্গানাইজেশন

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট থেকে

শিক্ষা আন্দোলন :

জাতীয় জীবনে আমরা এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। দেশে একদিকে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা-সম্পদ হারিয়ে অন্তহীন স্রোতের মতো নিঃস্বের কাতারে নেমে যাচ্ছে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর অনুকূলে অর্থনীতি রাজনীতির কাঠামো নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থনীতিতে যেমন তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও একদলীয় কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে– যা এদেশে ফ্যাসিবাদী শাসনকে আরও পাকাপোক্ত করছে। আশির দশকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো মুক্তবাজার অথনীতি চালু করেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী সরকার অর্থনীতিতে উদারীকরণের পালে জোর হাওয়া দিচ্ছে। স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-যোগাযোগসহ পরিষেবাখাতগুলোতে ভর্তুকি কমিয়ে ক্রমাগত বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। অন্যান্য খাতের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে। শিক্ষানীতি ২০১০ সরকারের এই নীতিরই সপ্রমাণ দলিল।

এরই ফলাফল হিসেবে, প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত–সমস্তক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুপাতে সরকারি বরাদ্দ কমছে। কিন্তু ফি বেড়েছে বহুগুণ। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না বাড়লেও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ছে। অথচ নব্বইয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের দশ দফায় বলা হয়েছিল, '...শিক্ষাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করা চলবে না। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে হবে।' কিন্তু বিগত দিনে কোনো সরকারই ছাত্রসমাজের এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। ফলে দরিদ্র মানুষের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের পথ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী তার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার কারণেই আজকের দিনে সর্বজনীন শিক্ষার চেতনা ধারণ করতে পারে না। সেই কারণে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাও তারা করেনা।

প্রাথমিক–মাধ্যমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষা কাগজে-কলমে বাধ্যতামূলক হলেও সরকার এখনো সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। দেশের বিপুল মানুষ এখনো অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সরকারি হিসাব মতে, দেশে শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে এই হার আরও অনেক কম। পরাধীন দেশে দাবি উঠেছিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার। পাকিস্তানিরা বলেছিল, 'অবৈতনিক শিক্ষা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা'। অথচ স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও এ দেশের শাসকশ্রেণী ৫ম শ্রেণী পর্যন্তই সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি। প্রাথমিক স্তরে সরকারি হিসেবেই ড্রপ আউটের হার ২৩ শতাংশ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিবেচনায় একজন মানুষকে সময়ের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে ন্যূনতম স্নাতক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক স্তর হওয়া উচিত। আমাদের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করে আসছে। সরকার সে দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, তাকে বাস্তবায়ন করতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নির্মাণ ও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। অপ্রয়োজনীয়ভাবে চালু হওয়া পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা শিক্ষার আনন্দ হরণ করে কোমলমতি শিশু ও অভিভাবকদের হয়রানি বাড়িয়েছে। ৮৬ শতাংশ স্কুলে সাধারণ শ্রেণী কার্যক্রম সংকুচিত করে কোচিংয়ে বাধ্য করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। নিছক ভাল ফলাফলের পেছনে ছোটানোর কৃত্রিম চাপ শিশুদের জীবনটাকেও আনন্দহীন করে তুলছে। পাশাপাশি পাশের হার বাড়িয়ে দেখানোর জন্যে উদারভাবে খাতা দেখা, উত্তরপত্র সরবরাহ, প্রশ্ন ফাঁস ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে।

বর্তমানে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় ২০ শতাংশ শিক্ষক নেই, ২৯ শতাংশ স্কুলে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই, ৭৮ শতাংশ স্কুলে নেই ল্যাবরেটরি। আয়োজনগত এসব অসম্পূর্ণতা রেখে চালু হওয়া সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সৃজনশীলতা বাড়ায়নি, বহুগুণে বাড়িয়েছে কোচিং ও গাইড বইয়ের ব্যবসা। ৫৫ ভাগ শিক্ষক জানেন না সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন কিভাবে করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে স্কুলস্তরে ফি বৃদ্ধিসহ শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় বহুগুণে বেড়েছে। এই কারণে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে আশঙ্কাজনক হারে কমছে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ড্রপ আউটের হার বাড়ছে।

লাগামহীন বেসরকারিকরণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমন এক স্বেচ্ছাচারিতা তৈরি করেছে, ফি বৃদ্ধির সরকারি নীতিমালাকেও তারা কোনো তোয়াক্কা করছেনা। এ বছরের শুরুতে ফি বৃদ্ধির অরাজকতার বিরুদ্ধে অভিভাবকেরা পথে নেমেছেন। আন্দোলনের মুখে আদায়কৃত ফি ফেরত দেয়ার সরকারি নির্দেশনা কেবল ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক পাঠ্য বই বিতরণের কৃতিত্বকে ফলাও প্রচার দিয়ে গোটা ধ্বংসন্মুখ শিক্ষাব্যবস্থার সকল অরাজকতাকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, অথচ শিক্ষাব্যবস্থার এতটা ভঙ্গুর দশা পূর্বে কখনই ছিলনা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : এক সময় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, এমসি কলেজ, বিএল কলেজ, কারমাইকেল কলেজের মতো অনেক কলেজেরই সুখ্যাতি ছিল, আজ তা অনেকটাই ম্লান। শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব, হল-সেমিনারসহ সামগ্রিক আয়োজন তৈরিতে অবহেলা এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। জ্ঞান বিতরণ নয়, কেবল পরীক্ষা নেবার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কলেজগুলো। ভেতরের মূল সংকট না কাটিয়ে সিলেবাস পরিবর্তন, গ্রেডিং পদ্ধতি ও নতুন প্রশ্নপত্র চালু, সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ সমস্যাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস অনুযায়ী ৩০ সপ্তাহ পাঠদান, ৪ সপ্তাহ পরীক্ষা প্রস্তুতি এবং ৬ সপ্তাহ বার্ষিক পরীক্ষা কর্যক্রম চলবে। ৪ বছরে গড়ে ১৮৬০ ক্লাসঘন্টা পাঠদান ছাড়া উপরোক্ত ক্রেডিট পূরণ করা সম্ভব নয়। এই হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর শুধু তত্ত্বীয় কোর্সের জন্য গড়ে ৩৫০টি ক্লাস হওয়া প্রয়োজন। সুপারিশে এই ক্রেডিট পূরণ করার জন্য ২১০ দিন ক্লাস আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। অথচ সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি এবং পরীক্ষা আয়োজনের কারণে বছরে ৩ মাসের বেশি কলেজ খোলা থাকে না।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অংশ হিসেবে নম্বর বন্টনের ১০টি গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন পাশের গ্রেড ডি (৪০%-৪৫%) এবং সর্বোচ্চ এ প্লাস (৮০% নম্বর বা তারও বেশি)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে প্রমোশন পেতে হলে জিপিএ ২.০০ এবং তৃতীয় বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হতে হলে জিপিএ ২.২৫ (৪৫%-৫০%) নম্বর পেতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতি আশা করা হয়েছে অথচ সারাবছর ক্লাস নিশ্চিত করাসহ নানামূখী আয়োজনের বিষয়ে কোনো কথা বলা হয়নি।

কলেজগুলোর ক্লাস কার্যক্রমের পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ। ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৭৫ দিনে ক্লাস হয়েছে ১১৫টি, গণিত বিভাগে ৫২ দিনে ১০২টি, উদ্ভিদবিদ্যায় ৮৫ দিনে ১০৪টি। অন্যান্য বিভাগেও একই অবস্থা। পরবর্তী বছরগুলোতেও এর বেশি ক্লাস হয়নি। কারণ এই সময়ের মধ্যে নতুন কোনো শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম নির্মাণসহ পাঠদানের সার্বিক আয়োজনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারমাইকেল কলেজের এই পরিসংখ্যান থেকে দেশের অন্যান্য কলেজের পরিস্থিতি সহজেই বোধগম্য।

সেশনজটের প্রকৃত কারণকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তথাকথিত যে ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে, তার ফলে পূর্বে যে ৭০-৭৫ দিন ক্লাশ হতো, এখন আর তাও হচ্ছে না। ২০১৩-১৪ সেশনে কারমাইকেল কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে ক্লাশ হয়েছে ৩০ দিন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ২১ দিন ক্লাশ হয়েছে। এভাবে নতুন নিয়মের ফলে পাঠদান প্রক্রিয়া একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কলেজে ছাত্র উপস্থিতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি তথা সিলেবাস শেষ করার জন্য ছুটতে হচ্ছে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। ফলে বেড়েছে শিক্ষাব্যয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৩টি। পর্যাপ্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার সুযোগে সাধারণ মানুষের শিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে বিপুল মুনাফার লোভে গড়ে উঠেছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগের নীতিকে উৎসাহিত করায় প্রতিবছরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। একসময় ধারণা ছিল, উচ্চবিত্তের সন্তানেরাই এখানে পড়াশোনা করে। বর্তমানে অনেক সাধারণ মানুষও একটু ভালো ভবিষ্যতের আশায় ঋণ করে, জমি বন্ধক রেখে সন্তানকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। এমনিতেই এখানে দু'লাখ থেকে শুরু করে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত টিউশন ফি নেয়া হয়। তারপরও প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি বাড়ছে। যেমন ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গত বছর আইন

বিভাগের মোট টিউশন ফি ছিল ৪ লক্ষ টাকা। এবছর সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায়। শুধু টিউশন ফি বৃদ্ধিই নয়, নানা রকমের অনিয়ম-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫টি বাদে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। ভাড়া বাড়িতে, শপিং মলের উপরে কোনো রকমে চলছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নেই। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগও দেয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্তসমূহ উপেক্ষা করে এভাবেই পরিচালিত হচ্ছে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়।সম্প্রতি ভ্যাট আরোপের মধ্য দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও ব্যয়বহুল করার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছিল, ছাত্রদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেনি। এই আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় : উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার যত কমিশন ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে, শিক্ষার মান তত অধঃগামী হচ্ছে। এবছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রণীত কৌশলপত্রের দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। গত ১০ বছরে কৌশলপত্রের সুপারিশ অনুসারে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ফি, সেমিস্টার ফি, বিভাগ উন্নয়ন ফিসহ নানাখাতে কয়েকগুণ ফি বেড়েছে। নতুন নতুন খাতে ফি আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রয়োজন অনুপাতে বরাদ্দ কমেছে। এভাবে কৌশলপত্রের আলোকে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার সেলফ ফিন্যান্সিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে চায়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভর্তুকি, বরাদ্দ কমিয়ে ধীরে ধীরে সেদিকেই এগুচ্ছে। সম্প্রতি শিক্ষকদের আন্দোলনেও প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা কোনো কিছুই সরকার তোয়াক্কা করেনা। ফলে আগামী দিনে বাণিজ্যিকীকরণের প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত হবে- এ কথা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল man making, character building-এর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠা। কিন্তু সেটা না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে গেছে বাজারের উপযোগী দক্ষ মানুষ তৈরি করা। এজন্য সিলেবাস সংস্কার করা এবং ক্লাশ-এ্যাসাইনমেন্ট-বাধ্যতামূলক পার্সেন্টেজের চাপ ছাত্রদের উপর আরোপ করা হচ্ছে। অপরদিকে পাঠদান পদ্ধতিতে গতানুগতিকতা ও সৃজনশীলতার অভাবে ছাত্রদের পড়াশুনায় আগ্রহ কমে যাচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে জ্ঞান চর্চা।

সরকারি বরাদ্দ না বাড়িয়ে বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিয়ে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প (হেক্যাপ) বিশ্ববিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে বহুজাতিক ও দেশীয় পুঁজিপতিদের উপর নির্ভরশীল করার অপচেষ্টা মাত্র। এই প্রকল্পের অধীন গবেষণাও জনকল্যাণে নয়, পুঁজিপতিদের চাহিদা ও স্বার্থের নিরিখেই পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের বরাদ্দ পেতে শিক্ষকদের মধ্যে হীন প্রতিযোগিতা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে প্রতিনিয়ত সংকোচিত করা হচ্ছে। ভিসি নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ সবই দলীয় বিবেচনায় করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষাকে পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার পরিপূরক করার প্রয়োজনে এখন সিলেবাস-কারিকুলাম প্রণয়ন তথা একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এই কমিশন গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশিষ্ট স্বাধীনতাও আর থাকবে না।

আবাসন সংকটের সুযোগে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বারান্দা, মসজিদ, ক্যান্টিন, গেমসরুমে অবস্থান করে অমানবিক জীবনযাপন করছে। হলগুলোতে নবীন শিক্ষার্থীদের কাছে 'গেস্টরুম' নামের টর্চারসেল এক মূর্তিমান আতঙ্ক। প্রথমবর্ষের ছাত্রদের উপর চলে র‍্যাগিং নামের মানসিক নির্যাতন। হলে থাকা ছাত্রদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের রিক্রুটমেন্ট হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রশাসনেরও অনুমোদন আছে। গত ২৫ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে আছে। সরকারি ছাত্র সংগঠনের নিরঙ্কুশ দখলদারিত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে নানা কথার চাতুরিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংসদ নির্বাচনের দায়িত্বকে আড়াল করছে।

এভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিকল্পিত উপায়ে শাসকশ্রেণীর অনুগামী-সহযোগী দক্ষ মানুষ তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করছে সরকার। অথচ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পয়সায়। ফলে জনগণের টাকায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়কে জনগণের কল্যাণে পরিচালিত করার দাবিতে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পেশা নির্বাচন সম্পর্কে একজন তরুণের চিন্তা

— কার্ল মার্কস

বেছে নেবার ক্ষমতা অন্য সকল সৃষ্টির তুলনায় মানুষের একটা বড় রকমের সুবিধা, কিন্তু সেই সঙ্গে এ হচ্ছে এমন এক বিধি যা তার সমস্ত জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে, পারে তার সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে এবং তাকে অসুখী করে তুলতে। কাজেই যারা সবে বৈষয়িক জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছেন, যারা তাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দৈবের হাতে ছেড়ে দিতে চান না সেই তরুণদের প্রথম কর্তব্য হলো এই বেছে নেয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে গুরুত্ব ও গভীর আন্তরিকতা সহকারে বিচার-বিবেচনা করে দেখা।

মানুষ মাত্রেরই মনে একটা উদ্দেশ্য থাকে যা অন্তত তার নিজের কাছে মহৎ বলে প্রতীত হয়। আপনার গভীরতম বিশ্বাস, অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিসৃত উচ্চারণ এই উদ্দেশ্যকে মহৎ বলে ঘোষণা করে তবে তা যথার্থই মহৎ। ....

কিন্তু এই উচ্চারণ সহজেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আমরা এক মুহূর্তে যাকে অনুপ্রেরণা বলে ধরে নেই তা' নিমেষের ব্যাপারে পরিণত হয়ে পর মুহূর্তেই হয়ে যেতে পারে নিশ্চিহ্ন। ...

গভীর আগ্রহের সাথে আমরা যাকে আলিঙ্গণ করে নেই অচিরেই তা আমাদের কাছে হয়ে ওঠে বিরক্তিকর এবং আমরা আমাদের গোটা অস্তিত্বকেই দেখতে পাই ধ্বংসের মুখোমুখি। ...

সুতরাং আমাদের অবশ্যই গভীর আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করে দেখা উচিত, আমরা আমাদের বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছি কিনা, এতে আমাদের অন্তস্থিত কণ্ঠস্বরের সায় আছে কিনা। ...

কিন্তু এই প্রেরণার উৎস কোথায় তা খুঁজে বের না করে এর স্বরূপকে আমরা চিনব কি করে?...

যা মহৎ তার একটা চমৎকারিত্ব আছে, এই চমৎকারিত্ব উদ্রেক করে উচ্চাকাঙ্ক্ষার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহজেই জন্ম দিতে পারে অনুপ্রেরণার কিংবা তার যাকে আমরা অনুপ্রেরণা বলে ভ্রম করি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভূত যার ঘাড়ে চেপে বসে যুক্তি তাকে সংযত করতে পারে না আর এবং সে বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায়। তখন সে অবিমৃষ্যকারী আর জীবনের ক্ষেত্রে বাছ-বিচার করে না। পক্ষান্তরে তা নির্ধারিত হয়ে দৈব কিংবা মোহান্ধ বিভ্রমের বশে। ...

যে ক্ষেত্র আমাদেরকে সবচে' সুন্দর সুযোগ দান করে তা অধিকার করার আহ্বান আমরা শুনি না। যে ক্ষেত্রে বহু বৎসর অবস্থান করেও আমরা ক্লান্তি বোধ করব না, আমাদের উদ্দীপনা স্তিমিত হবে না আমাদের উৎসাহ নিষ্প্রভ হবে না, সে ক্ষেত্রে এটা নয়। বরং এ হচ্ছে এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে অবস্থান করে অচিরেই আমরা দেখব আমাদের ইচ্ছাসমূহ অপূর্ণ, ধারণাসমূহ অতৃপ্ত, এবং আমরা তার জন্য বিধাতাকে অভিযুক্ত করব এবং মনুষ্য-সমাজকে অভিশাপ দেব।

বিশেষ কোনো পেশার প্রতি আমাদের মনে হঠাৎ যে উৎসাহ জেগে উঠে তার কারণ শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, অনেক সময় আমরা তাকে কল্পনার রঙ্গে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে তুলি যে তাকেই জীবনের সর্বোচ্চ দান বলে মনে হয়। আমরা তাকে বিশ্লেষণ করে দেখি না, যে বিরাট বোঝা ও দায়িত্বের ভার তার সঙ্গে আমাদের ওপর অর্পিত হয় সে সম্পর্কে কোনো সামগ্রিক চিন্তা আমরা করি না, তাকে আমরা শুধু দূর থেকেই দেখি আর এখানে দূরত্ব মাত্রই প্রতারক।

আমাদের নিজেদের যুক্তি এখানেও আমাদের পরামর্শদাতা হতে পারে না কারণ, এর পেছনে সমর্থন আছে, না কেনো অভিজ্ঞতার না কোনো গভীর পর্যবেক্ষণের। আমাদের নিজেদের যুক্তি আবেগের দ্বারা প্রতারিত ও উদ্ভট কল্পনার দ্বারা অন্ধ।

তাহলে কার দিকেই বা আমরা তাকাব? আমাদের যুক্তিই যেখানে আমাদের ত্যাগ করে সেখানে আমরা নির্ভর করব কার ওপর?

হৃদয় আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে আমাদের নির্ভর করতে হবে পিতামাতার ওপর যারা জীবনের দীর্ঘপথ পরিক্রম করেছেন এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুরতার আস্বাদন লাভ করেছেন।

আমাদের আগ্রহ এর পরও যদি অবিচল থাকে, কোনো পেশার প্রতি আমাদের ভালবাসা যদি তারপরও অব্যাহত থাকে এবং ঠান্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা করার পরও এবং দায়িত্বভার ও যাবতীয় সুবিধা ও অসুবিধাগুলো অনুধাবন করার পরও যদি এর প্রতি আমাদের আকর্ষণ অটুট থাকে, তাহলে তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত সে অবস্থায় আমাদের আবেগ আমাদেরকে প্রতারিত করে না এবং তাড়াহুড়োর আধিক্যও আমাদেরকে বিপথগামী করে না। .....

কিন্তু যে পেশা গ্রহণের জন্য আমরা অন্তরের আহ্বান শুনতে পাই তা সব সময় লাভ করতে পারি না। সমাজের মধ্যে আমাদের সম্পর্কাদি নিরূপিত করার মতো অবস্থায় আমরা নিজেরা উপনীত হবার আগেই সেগুলো অনেকাংশেই নির্ধারিত হতে শুরু করে। .....

এ সবকিছু যদি আমরা বিবেচনা করি এবং ইচ্ছেমত পেশা বেছে নেয়ার অবস্থা যদি আমাদের জীবনে আসে, তাহলে আমাদের এমন পেশা বেছে নেয়া উচিত যা থেকে আমরা সবচে বেশি উপকৃত হবার নিশ্চয়তা পাই, যে পেশা আমাদের সন্দেহাতীত সত্য ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে পেশা মনুষ্য সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করার এবং নিজেদের জন্য সাধারণ লক্ষ্যের নিকটবর্তী হওয়ার সর্বাধিক সুযোগ আমাদের দান করে। প্রত্যেক পেশাই হচ্ছে সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় মাত্র সে লক্ষ্য হলো পরিপূর্ণতা অর্জন। ....

মূল্যবান হলো তা ই যা মানুষকে সবচে বেশি উন্নত করে, যা তার সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে করে তোলে সমুচ্চ মহত্বমণ্ডিত, যা তাকে করে অপরাজেয়, জনসমাজের প্রশংসাভাজন এবং সমাজের শিরোমণি। .. মানবজাতির কল্যাণ সাধন এবং আমাদের নিজেদের পরোৎকর্ষ অর্জন পেশা নির্বাচনের কালে এ দুটোই হওয়া উচিত আমাদের অবশ্যম্ভাবী মুখ্য পথ নির্দেশক। .....

এ দুটি বিষয়ের মধ্যে এমন কোনো বিরোধের কথা ভাবা যায় না, যার পরিণামে উভয়ই পিষ্ট হয়, বিপরীত পক্ষে মানুষের স্বভাবই এমন যে সে তার সহযাত্রী মানুষদের উৎকর্ষের জন্যে, মঙ্গলের জন্যে কাজ করেই নিজের পরোৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়। ....

কেউ যদি নিছক নিজের জন্যেই কাজ করেন তবে হয়তো তিনি বিখ্যাত জ্ঞানী বলে নাম কুড়োতে পারেন, মহাকায় সন্ত বা উঁচু দরের কবি হতে পারেন কিন্তু কখনও পরিপূর্ণ প্রকৃত মহৎ মানুষ হয়ে ওঠতে পারেন না।

ইতিহাস সেই সব ব্যক্তিদেরই মহত্তম বলে স্বীকার করে যারা সর্বজনীন মঙ্গলের জন্যে কাজ করে নিজেদেরকে মহত্ত্বমণ্ডিত করেছেন। অভিজ্ঞতা সজোরেই বলে যে, তারাই সবচে সুখি, সম্পন্ন যারা সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সুখ বিধান করেন। ....

জীবনে যদি আমরা এমন স্থান বেছে নেই যেখান থেকে আমরা মানবজাতির জন্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারব, তাহলে কোনো বোঝার ভারই আমাদেরকে নোয়াতে পারবে না। কেননা তা হবে সকলের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ তখন আমরা কোনো হীন, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ উপভোগে বিভোর থাকব না, আমাদের সুখ হবে কোটি কোটি মানুষের সুখ, আমাদের কীর্তি নিঃশব্দে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে কর্মের মধ্যে দিয়ে এবং আমাদের চিতাভস্ম সিক্ত হবে মহৎ মানুষদের তপ্ত অশ্রু বর্ষণে।

['পেশা নির্বাচন সম্পর্কে একজন তরুণের চিন্তা' এটি কার্ল মার্কসের প্রথম রচনা। সংক্ষেপে এখানে প্রকাশ করা হলো। লেখাটি কার্ল মার্কস- ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (প্রগতি পাবলিসার্স, মস্কো ১৯৭৫) থেকে সংগৃহীত]

যুব সমাজের কর্তব্য

——— লেনিন

কমরেডগণ, আজ আমি আপনাদের যুব কমিউনিস্ট লীগের মৌলিক দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলব এবং সেই প্রসঙ্গে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যুব সংগঠনগুলি সাধারণভাবে কী জাতীয় হওয়া উচিত তা-ও আলোচনা করব।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রথম যে-ধারণা জন্মায় সেটা এই যে, সাম্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের অর্থ হলো সাম্যবাদী পত্রিকাসমূহ, পুস্তিকা এবং গ্রন্থরাজির দ্বারা আহৃত জ্ঞানার্জনের সমন্বয় সাধন। কিন্তু সাম্যবাদ অধ্যয়নের এই সংজ্ঞা অত্যন্ত কাঁচা এবং অসম্পূর্ণ। যদি সাম্যবাদ-অধ্যয়ন কেবলমাত্র সাম্যবাদী গ্রন্থ এবং পুস্তিকাগুলিতে প্রচারিত বিষয়সমূহের সমন্বয় সাধনই হয় তাহ'লে আমরা অতি সহজেই পুঁথির ভেল্কি-দেখানো কমিউনিস্টদের অথবা অসার দাম্ভিকদের সন্ধান করব, এবং এর ফলে প্রায়ই আমাদের ক্ষতি হবে, কেননা এই সমস্ত লোকেরা সাম্যবাদী গ্রন্থ এবং পুস্তিকাসমূহ কেবল মুখস্থ করে যা শিখবে তার ফলে তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয় ঘটাতে অসমর্থ হবে এবং সাম্যবাদ-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তারা কাজও করতে পারবে না।

পুরোনো পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের ওপর সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং দুর্ভাগ্যজনক যে বোঝাটি চাপিয়ে দিয়েছে তাহ'ল বইয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধন; আমরা এমন সমস্ত বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যে-গুলিতে প্রায় সমস্ত বিষয়েরই অতি চমৎকার ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বইগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ভণ্ডামিপূর্ণ মিথ্যা বোঝাই এবং এগুলিতে পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া আছে।

তাহ'লে প্রশ্ন ওঠে এই যে, সমস্ত ভাবধারাকে মিশিয়ে কীভাবে সাম্যবাদ অধ্যয়ন সম্ভব? আমরা প্রাচীন মতবাদ থেকে এবং পুরনো ধরনের বৈজ্ঞানিক চেতনা থেকে কী কী গ্রহণ করব? পুরনো ধাঁচের বিদ্যালয়গুলির একটা ঘোষিত নীতি ছিল, সব বিষয়ে শিক্ষিত ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা। আমরা জানি এই নীতি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কারণ সমস্ত সমাজ শোষক ও শোষিত– এই দুই শ্রেণীতে জনগণের বিভক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল এবং এর দ্বারাই পরিচালিত। যেহেতু পুরনো ধাঁচের বিদ্যালয়গুলি শ্রেণী মনোভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা বুর্জোয়াদের জ্ঞান বিতরণ করে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শ্রমিক এবং কৃষকদের, তরুণ উত্তরাধিকারীরা ঠিক ততটুকুই শেখে যতটুকু বুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাদের এমনভাবে শেখানো হয় যাতে তারা বুর্জোয়াদের প্রয়োজনীয় ভৃত্য হয়ে উঠতে পারে এবং বুর্জোয়াদের শান্তি ও বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মুনাফার যোগান দিয়ে যেতে পারে। সেই জন্যই পুরনো ধাঁচের বিদ্যালয়গুলি বর্জন করার সময় আমরা সিদ্ধান্তই নিয়েছি যে, যথার্থ সাম্যবাদী শিক্ষার জন্য যা প্রয়োজন কেবলমাত্র সেটুকুই আমরা এর থেকে গ্রহণ করব।

পুরনো বিদ্যালয় সম্পর্কে যে-সব সমালোচনা আমরা অবিরত শুনে থাকি এবং যার থেকে প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত টানা হয় আমরা সেই প্রসঙ্গে এসে পড়ছি। এমন কথা বলা হয় যে, পুরনো বিদ্যালয়গুলিতে কেবল পুঁথি-সর্বস্ব জ্ঞান অর্জন করা হত এবং সেখানে গতানুগতিক অনুশীলন ও মুখস্থবিদ্যার চর্চা চালানো হয়। একথা সত্য, কিন্তু পুরনো ধাঁচের বিদ্যালয়গুলিতে কী কী বাজে জিনিস ছিল এবং এদের মধ্যে কোনগুলিই বা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আমাদের তা অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে। এদের মধ্য থেকে সাম্যবাদের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তাকে বেছে নিতে হবে।

পুরনো বিদ্যালয়গুলিতে কেবল পুঁথিসর্বস্ব জ্ঞান বিতরণ করা হত; তারা ছাত্রদের অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক ও ভাসা-ভাসা জ্ঞান অর্জনে বাধ্য করত, এই সমস্ত জ্ঞান তরুণদের মাথার মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে জড়ো হয়ে তাদের নির্দিষ্ট একটি ছাঁচে-ঢালা আমলা পরিণত করত। কিন্তু যদি কেউ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে, মানবজাতি যে-জ্ঞান সম্পদ আহরণ করেছে তাকে আত্মস্থ

না করে যে কেউ সাম্যবাদী হতে পারে তাহ'লে সে প্রচণ্ড ভুল করবে। যে-জ্ঞান সমষ্টির পরিণত ফল হচ্ছে সাম্যবাদ, তাকে না জেনে কেবল সাম্যবাদী স্লোগান ও সাম্যবাদী বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহকে জানাটাই যথেষ্ট, এরকম চিন্তা করাটাও ভুল হবে। মানবজাতির অর্জিত জ্ঞান সমষ্টি থেকেই সাম্যবাদ উদ্ভূত হয়েছে–মার্কসবাদ নিজেই হচ্ছে তার নজির।

তোমরা নিশ্চয় পড়েছ এবং শুনেছ যে, সাম্যবাদী তত্ত্ব–সাম্যবাদের বিজ্ঞান প্রধানত মার্কসেরই সৃষ্টি বলে একে মার্কসবাদী মতবাদও বলা চলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর কেবলমাত্র একমাত্র সমাজতন্ত্রীর সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মার্কস ছিলেন একজন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি সর্বহারা যারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই মতবাদকে প্রয়োগ করেছে–এখন তাদেরই সম্পত্তি হয়ে গেছে। যদি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে হয় যে, কেন মার্কস-এর শিক্ষা লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি সবচেয়ে বিপ্লবশ্রেণীর মানুষের হৃদয় এবং মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল তাহলে আপনারা এর একটাই উত্তর খুঁজে পাবেন, মার্কস-এর এই সাফল্যের কারণ তিনি পুঁজিবাদী সভ্যতায় অর্জিত মানুষের জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিতেই তাঁর তত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছিলেন। যে-সমস্ত নিয়মাবলী মানবসমাজের অগ্রগতি নির্ধারিত করেছে সেগুলি বিশ্লেষণের পর পুঁজিবাদ যে অনিবার্যভাবেই সাম্যবাদে পরিণত হবে মার্কস তা উপলব্ধি করেছিলেন। সবচেয়ে যেটা জরুরি তাহ'ল, মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের সংহত, বিস্তৃত ও অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই এই সত্য প্রমাণ করেছিলেন, প্রথম যুগের বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারকেই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। মানব সভ্যতা আজ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তার প্রত্যেকটিকেই তিনি যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ঢেলে সাজিয়েছেন, কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি অগ্রাহ্য করেননি। মানুষের চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি করেছে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের পুনর্বিবেচনা, সমালোচনা এবং যাচাই করেছেন; এবং তার থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা বুর্জোয়া-সীমাবদ্ধতা বা বুর্জোয়া-সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হত না।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, যখন আমরা সর্বহারার সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলব তখন আমাদের এই সত্যটি মনে রাখা দরকার। যতদিন না আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব যে, মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতি ও বিকাশের ফলে যে-সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন না করলে আমরা সর্বহারার সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারব না, ততদিন আমাদের পক্ষে এই সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে না। সর্বহারার সংস্কৃতি নামক বস্তু হাল্কা বাতাসে ভেসে বেড়ায় না; যারা নিজেদের সর্বহারার সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে মনে করেন এটা তাদের আবিষ্কারও নয়। এসমস্তই বাজে কথা। মানব সমাজ পুঁজিবাদী, জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক সমাজের অধীনে থেকে যে-জ্ঞানসমূহ অর্জন করেছে সর্বহারার সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমাগতই নিয়ে যেতে থাকবে, যেমন করে মার্কস অর্থনীতির নব-রূপায়ণ করে আমাদের দেখিয়েছেন যে, মানব সভ্যতার চূড়ান্ত পরিণতি কী, শ্রেণী সংগ্রাম ও সর্বহারার বিপ্লবের সূচনার পথই বা কী?

আমাদের কেবল মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের মন যাতে মূল বিষয়বস্তুগুলির জ্ঞানে উন্নত ও খাঁটি হয়ে ওঠে সেটা আমাদের নিশ্চয়ই প্রয়োজন। একজন সাম্যবাদী যে-সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছে তা যদি সে পরিপাক করতে না পারে তাহ'লে সাম্যবাদ একটি শূন্যগর্ভ শব্দ অথবা কেবল একটা সাইনবোর্ড হিসেবে টিকে থাকবে এবং সাম্যবাদীরা নিছক হামবড়া মানুষ হয়ে থাকবে। তোমরা কেবল এই জ্ঞানকে আত্মস্থ করবে না, একে সমালোচনার সঙ্গে গ্রহণ করবে, যাতে তোমার মন নিরর্থক ক্লান্তির ভারে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে এবং আজকের দিনে একজন সুশিক্ষিত মানুষের যা যা অপরিহার্য সেই সমস্ত তথ্যের দ্বারা তোমার মন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যদি একজন সাম্যবাদী গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠোর কার্যপ্রণালীর মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালিয়ে এবং যে-সমস্ত তত্ত্ব তাঁর খুঁটিনাটিভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল সেগুলিকে বিশ্লেষণ না করে, কেবলমাত্র ছকে তৈরি সিদ্ধান্তসমূহে পৌঁছানোর ভিত্তিতে তার সাম্যবাদ সম্পর্কে অসার দম্ভ প্রকাশ করতে থাকে, তাহ'লে বাস্তবিকপক্ষে সে একজন নিন্দনীয় সাম্যবাদী বলে গণ্য হবে। এই জাতীয় ভাসা-ভাসা মনোভাব নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। যদি আমি জানি যে, আমার জ্ঞান অত্যন্ত কম, তাহলে আমি আরও কিছু শিখবার চেষ্টা করব; কিন্তু যদি কেউ বলে বসে যে, সে একজন সাম্যবাদী এবং তার কোন কিছুই বিস্তৃতভাবে জানার প্রয়োজন নেই, তাহলে সে আর যাই হোক, কোনদিনই একজন সাম্যবাদী হতে পারবে না।...

['যুব লীগসমূহের কর্তব্য', ১৯২০ পুস্তিকা থেকে সামান্য সংক্ষেপিত]

ছাত্র ও যুবসমাজের কর্তব্য

—— শিবদাস ঘোষ

...কমরেডস, সারা ভারত ডি এস ও-র উদ্যোগে আয়োজিত এই সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন আমাদের দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে সমাজজীবনে রুচি-সংস্কৃতি ও নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সংকট আরও গভীরে দেখা দিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ করছেন এবং আমার ধারণা দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও গভীর বেদনা ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছেন যে, আমাদের রুচি-নীতিনৈতিকতার মান ক্রমাগত দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

... আমাদের দেশের প্রতিটি সৎ, চিন্তাশীল ব্যক্তিকে যে ভাবনা প্রতি মুহূর্তে আলোড়িত করে তুলছে, তা হল, কেন এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি? কী করে আমাদের সমাজে এই অসহনীয় এবং হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির ফেনোমেনন সৃষ্টি হল? সমস্যাটির গভীরে গিয়ে আপনাদের তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ, আমি মনে করি, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি বিষয়টা আমরা ঠিকমতো ধরতে এবং ঠিকমতো বুঝে তার সঠিক উত্তরটা বার করতে না পারি তাহলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামগুলোকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়ে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ রয়েছে। কারণ, আপনারা সকলেই জানেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমস্ত সামাজিক সমস্যাই সবসময়েই কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রশ্নের সাথে, কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে যেগুলির সমাধান ছাড়া এইসব সমস্যার কোনওটারই সুরাহা করা সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলি দেশের রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিশেষ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সাথে–যাকে আমরা পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলি–তার সাথে যুক্ত। প্রতিটি সামাজিক ব্যাধি, যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে তা এই বস্তুগত ভিত্তি থেকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা– এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যা শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন, যা ভারতবর্ষের মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে রাষ্ট্র শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যপূরণ ও শ্রেণীশাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও সংহত ও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনা করে।

কমরেডস, আপনারা সর্বদা মনে রাখবেন, শাসন পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের দলগুলো যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, বাস্তবে জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এমনকী যখন তারা জাতি ও জাতীয় স্বার্থের কথা বলে তখনও তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল, জনসাধারণের দেশাত্মবোধকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণী উদ্দেশ্যকে হাসিল করা। ফলে যে জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে খানিকটা প্রগতিশীল ছিল এবং ততটুকু অর্থে সেদিন জনগণের স্বার্থ পূরণ করেছিল, আজ তা শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে পুরোপুরি সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে এবং জনসাধারণকে প্রতারণা করে ও ধাপ্পা দিয়ে তাদের দৃষ্টিকে প্রকৃত সমস্যা থেকে সরিয়ে বিপথে চালিত করার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। জনসাধারণকে বিপ্লবী আন্দোলনের মূল ধারা থেকে দূরে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এবং পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলো প্রায়ই এই প্রতারণামূলক হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করে থাকে।

বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলোর এই কৌশলে জনসাধারণ যাতে প্রতারিত না হন তার জন্য তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে আপনাদের সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজ একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। আমাদের জাতি একটা অবিভাজ্য জাতি নয়। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, কোনও সচেতন মানুষই এই কঠোর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন না যে, আমাদের সমাজ একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।

কমরেডস মনে রাখবেন, ইতিহাসে উৎপাদনের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে এসে সমাজে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীসংগ্রামগুলির জন্ম হয়েছে এবং যখন থেকে এগুলির জন্ম হয়েছে তখন থেকেই বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামগুলি আমাদের চেতনা নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবেই সমাজে অবস্থান করে চলেছে। একই সাথে একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, মানবসমাজের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণীসংগ্রামই মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের পথে মানব ইতিহাস থেকে যতদিন শ্রেণী, শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীর হাতে দমন পীড়নের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র অবলুপ্ত না হচ্ছে ততদিন সমাজে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে। সুতরাং এরকম একটি পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ঐক্য, শিক্ষা এবং শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারেনা। এই সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে যে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি, তা প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল কিনা, তা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষে হোক রক্ষা করছে কিনা, নাকি মেহনতি মানুষের ও তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থকে রক্ষা করছে–তা শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে। সংগ্রামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত পথ শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, বিপজ্জনকও বটে। যে কোনও সৎ, চিন্তাশীল মানুষ, যাঁরা বিপ্লবের কথা বলেন, তাঁদের একথাটা বুঝতেই হবে। কারণ, যদি তাঁরা সত্যিসত্যিই সমাজের পরিবর্তন আনতে চান এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে চান তাহলে যে বিশেষ নিয়মগুলো শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে ওঠার পথে সমস্ত ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই সমস্ত নিয়মগুলোকে তাঁদের জানতেই হবে। আর তা না জানা পর্যন্ত কোনওমতেই আমরা সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারব না, সমাজ পরিবর্তন ও বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা আমাদের যতই থাকুক না কেন, পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোনও প্রভাবই আমরা ফেলতে পারব না। এমতাবস্থায় আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমস্ত তত্ত্ব হয়ে পড়বে বন্ধ্যা এবং সমস্ত ক্রিয়া অন্ধ ক্রিয়ায় পর্যবসিত হবে। এটা আমি বিশ্বাস করি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি। তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাস করে নির্দিষ্ট শ্রেণী এবং শ্রেণীস্বার্থের কথা উল্লেখ না করে যদি কেউ সাধারণভাবে শুধু 'জাতি', জাতীয় স্বার্থ', 'সামাজিক অগ্রগতি', 'সামাজিক স্বার্থ', 'শিক্ষার সংস্কার' প্রভৃতির কথা বলেন তাহলে বলতে হয় তিনি একজন অজ্ঞ, মূর্খ, আর না হয়, কি বলব, তিনি একজন ভণ্ড। এই প্রসঙ্গে সি পি আই এবং সি পি আই (এম)- এর কথা উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। তারা উভয়েই নিজেদের আজও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করে। এই দু'টি দল ও তাদের ছাত্র সংগঠন এ আই এস এফ এবং এস এফ আই শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সুর মিলিয়েই 'চাকরিমুখী', 'কর্মমুখী' বা 'উৎপাদনমুখী' শিক্ষাপ্রবর্তনের কথা বলছে। অথচ, তারা কি এটা আদৌ বোঝে না যে, উৎপাদনবৃদ্ধির অজুহাত খাড়া করে চাকরিমুখী বা কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে নিছক কারিগরি ও নিতান্তই তথ্যসর্বস্ব শিক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর চক্রান্ত মাত্র? প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হলে তো এটা তাদের না বোঝার কথা নয়। শিক্ষাসংস্কারের নাম করে বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের দলগুলো এহেন একটি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন যে ওকালতি করে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার অবাক লাগে যখন দেখি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করে যে সি পি আই, সি পি আই(এম), সেই দলগুলোও শিক্ষা সংস্কারের নাম করে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে রচিত এইরকম একটা হীন পরিকল্পনাকে সমর্থন করে এবং এইসব প্রশ্নে প্রায় একই সুরে কথা বলে। এ অবস্থায় এদের কী বলব–অজ্ঞ, নির্বোধ, নাকি ভণ্ড?

...কমরেডস, আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাকে কেবলমাত্র দু'টি দৃষ্টিকোণ, দু'টি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যেতে পারে। এর একটা হল ক্ষমতাসীন শোষক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন সুরে, এমন ধাঁচে এবং এমন ব্যক্তিদের পরিচালনায় গড়ে তোলা যার ফলে কর্তব্যকর্মে অবহেলা, পেশাগত অহংবোধ, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনীহা প্রভৃতি কতকগুলি সমাজপ্রগতিবিরোধী মানসিক ধাঁচা গড়ে ওঠে, যা স্বভাবতই বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার ও সকলপ্রকার পুরনো ভাবনাচিন্তার উপর নির্ভরশীল এবং শেষপর্যন্ত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও দায়দায়িত্বের প্রতি বীতস্পৃহ মনোভাব গড়ে তোলে। আর একটা হল বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা, তথা দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, নীতিনৈতিকতা, রুচি,

মূল্যবোধ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল ও নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে যে বিপ্লবী আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য আজ অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরি, সেই আন্দোলনের পরিপূরক বৈজ্ঞানিক বিচারধারা ও মানসিকতাকে সুনিশ্চিতভাবে গড়ে তোলবার জন্য যুক্তির চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারকে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সকল প্রশ্নকে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষাসমস্যা এবং শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি একটি নয়, দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই স্বাভাবিক এবং থাকতে বাধ্য।

...কমরেডস, মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্য শুরুতেই যাঁরা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কোনওদিনই সংখ্যায় বেশী থাকেন না। তাঁরা সবসময়েই মুষ্টিমেয়। তাঁরা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক। প্রতিটি দেশেই সমাজবিকাশের প্রতিটি স্তরে এই ছাত্র-যুবরাই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে জনগণের কাছে যান, হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, সংগঠিত করেন, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সাহায্য করেন। এরপরই সময় আসে গণঅভ্যুত্থানের, আর তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। তার আগে আপনাদের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে– যা কঠোর, কঠিন, কষ্টকর, কিন্তু আনন্দময়। আমি বলি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের এবং মর্যাদার পথ। হ্যাঁ, সংগ্রামের এই পথ অত্যন্ত বেদনাময় হতে পারে, কখনও কখনও তা খুবই কষ্টসাধ্যও হতে পারে, তবুও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মর্যাদাময় জীবনযাপনের এটাই একমাত্র পথ। এই সংগ্রামে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে, কিন্তু আপনারা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে মৃত্যুকে বরণ করবেন। অবমাননা এবং গ্লানি নিয়ে কুকুর বেড়ালের মত রাস্তায় পচে মরবেন না। মনে রাখবেন, মানুষ মাত্রই মরণশীল। তাই মরতে যখন হবেই তখন নিজেকে করুণার পাত্র করে, অবমানিত করে, ভিক্ষুকের মত মরবেন না। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মর্যাদার সাথে মৃত্যুকে বরণ করুন। আর মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা বা মৃত্যুকে বরণ করার একটাই মাত্র নিশ্চিত পথ রয়েছে। তা হল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রাখা। বলাবাহুল্য, এর জন্য অতি অবশ্যই হাজারে হাজারে আপনাদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

...আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনাদের সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ

[১৯৭৪ সালের ১৩ ই জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে বারবাটি স্টেডিয়ামে সারাভারত ডি এস ও-র উদ্যোগে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণ। ১৯৭৪ সালের ১৫ই মার্চ এসইউসিআই(সি)-র ইংরেজি মুখপত্র প্রলেটারিয়ান এরা-তে প্রথম প্রকাশিত। এখানে কিছুটা সংক্ষেপিত করে ছাপা হলো]

সামাজিক প্রয়োজনের জন্য যদি শিক্ষা হয়, তাহলে এই প্রয়োজন ধারণ করা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ হওয়া অসম্ভব

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বিপ্লবী পার্টির একজন সংগঠক হিসেবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ নিয়ে আমাদের একটা পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক এবং এর সাথে যুক্ত করে একই ধারার, একই সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমে যাতে দেশের সমস্ত ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তাই আমরা চাই। কারণ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিভিন্ন রকম হতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার এই মূল ভিত্তির উপর আলোচনা করার আগে দেশের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে হবে।

. . .পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যেহেতু গড়ে উঠেছিল মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে, তার কূপমণ্ডুকতাকে উস্কে দিয়ে - তাই পত্তনের পর ধর্ম ও তার নীতি নৈতিকতাকে পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্রটি চলতে থাকে। এই পরিকল্পনার অযৌক্তিক-অনৈতিক প্রভাব, উপরন্তু পাকিস্তানি বর্বরতা - এসব কারণে এদেশের মানুষ ধীরে ধীরে আন্দোলন শুরু করে। কোনো দেশেই, প্রথমেই সমগ্র সমস্যা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় না। আমাদের দেশেও হয়নি। এখানে লড়াই শুরু হয় ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বাঙলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মানবিক বিকাশের প্রয়োজনের জন্যই এই ভাষা। তাই ভাষার উপর আক্রমণে এদেশের লোক প্রতিবাদ করেছে, রুখে দাঁড়িয়েছে। আবার ভাষা নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটিও এসেছে। আমরা জানি, অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর অন্য সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। ফলে পাকিস্তানি শাসকদের সাথে যে অর্থনৈতিক বিরোধ তাই চিন্তা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরোধ তৈরি করলো, এটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি রচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

...ফলে ঐতিহাসিকভাবেই পাকিস্তান সৃষ্টির অসারতা প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো যে শুধু ধর্মের মিল থাকলেই জাতি গঠিত হয়না। তাই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত অন্দোলন ধীরে ধীরে পাকিস্তান বাতিল করার দিকে নিয়ে গেল। এই লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে কী ভয়ঙ্কর-ভয়াবহ-মর্মান্তিক পরিণতির মধ্য দিয়ে এদেশ বিদেশি পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত হলো! এভাবে আরও একবার মুক্ত হয়েছিল বৃটিশদের কাছ থেকে। যদিও বৃটিশদের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না। কারণ স্বাধীনতার সংগ্রাম যেসব উপাদানগুলিকে নিয়ে হয়, সেটা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকার সময় ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসার জন্য নানা ধরনের যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত হয়েছে সেগুলিরই outcome হিসেবে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান যখন তৈরি হলো এবং সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে আমাদের এখানে যে আন্দোলন গড়ে উঠল, সে আন্দোলনই স্বাভাবিকভাবে সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক চিন্তা নিয়ে এলো। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা এই চিন্তাগুলোকে ধারণ করতে পারেনি। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী রাজনৈতিক নেতারা জনগণের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার চিন্তাকে ধারণ করতে পারেননি। এর কারণ কী? রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী লোকেরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঝাণ্ডাটা কেন ফেলে দিলেন?

...একটা বিষয় বোঝা দরকার, সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক এই চিন্তাগুলোর যে শ্রেণীগত প্রয়োজন, সেটা আজকের যুগে কেবল সর্বহারা শ্রেণীই ধারণ করে। বুর্জোয়া শ্রেণী যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধারণ করতে পারেনি তার জন্য আমি তখনকার প্রভাবশালী কিছু মানুষকে mean করছি না। যে শ্রেণীটি স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলো, তাকেই বোঝাতে চাইছি। ওই মানুষগুলো ছিলেন সেই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। আজও তারাই continue করছে, শুধুমাত্র পরিচালকদের পরিবর্তন হয়েছে। ফলে স্বাধীনতার পর এতগুলো বছরেও শাসকদের সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক-বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানো কোনোভাবেই সম্ভব হল না। শুধু তাই নয়, এরকম একটি শোষণ-বৈষম্যের সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য

পিছিয়ে পড়া-কুসংস্কারগ্রস্ত-কূপমণ্ডূক চিন্তার ব্যাপক বিস্তার শাসকদের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা এসবকে উৎসাহিত করেছে। এখনো সেই প্রয়োজন। এই বিষয়গুলো আমাদের ছাত্র-যুবকদের ভাবতে হবে।

লেখাপড়া কিসের জন্য শেখা? দেশের কোন না কোন ক্রিয়া, তার সামাজিক অবস্থানকে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু দেশের অবস্থাই যদি সঠিকভাবে না জানি তাকে আমি service দেব কীভাবে? আমরা এমনভাবে শিক্ষিত হচ্ছি যেন শিক্ষার্জনটাই হলো ব্যক্তিগত বিষয়। শিক্ষা অর্জন আবার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে হতে পারে নাকি? এর কোনো উপায়ই নেই। একজন ব্যক্তি যখন যেকোন ক্ষেত্রে দক্ষ হয় তখন তার প্রয়োগ হয় কোথায়? সমাজেই তো হয়। তাহলে সামাজিক প্রয়োজনের জন্যই ত শিক্ষা। সামাজিক প্রয়োজনের জন্য যদি শিক্ষা হয়, তাহলে একজন শিক্ষিত মানুষের কিভাবে গড়ে ওঠা উচিত? সমাজের প্রয়োজনকে ধারণ করা ব্যতিরেকে শিক্ষিত মানুষ হওয়াই মুশকিল।

...এখন শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গে আসি। আমরা এমন একটা সময়ে এসেছি যখন একজন সহায়-সম্বলহীন মানুষও তার সন্তানের লেখাপড়ার কথা ভাবে। আবার জীবন ধারণ করতে গেলে কিছু লেখাপড়া করতেই হবে। কেননা কোনো না কোনো দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হয়। সমাজ তো দায়িত্ব নেয় না, নিজেরটা কোনোমতে চালিয়ে নেয়ার জন্য হলেও পড়াশুনা শিখতে হয়। আবার ফাটকা কারবারি, এটা-ওটা করার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যতটুকু প্রসার ঘটেছে, তারাও শিক্ষা গ্রহণ করতে আসছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে ভীষণ প্রতিযোগিতা। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষকে ঠকিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে অঢেল টাকা জমেছে। আরও বেশি মুনাফা করতে তারা এই টাকা কোথায় বিনিয়োগ করবে? এজন্য তারা শিক্ষাখাতকে বেছে নিয়েছে। লুটপাটকারী, দুর্নীতিবাজরা নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শপিং মলের মতো। এখান থেকে যারা বের হচ্ছে তারা কিভাবে শিক্ষিত হচ্ছে? তাদেরকে শিক্ষিত করা হচ্ছে 'কর্মমুখী', 'উৎপাদনমুখী' এসব শিক্ষার কথা বলে। কারিগরি শিক্ষার সাথে মানবিক শিক্ষা না দেয়ার কারণে সাহিত্য শেখা, ভাষা আয়ত্ব করা, শেক্সপিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ বা বার্নাড শ থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সবকিছু জানবার যে প্রবল আগ্রহ যৌবনে তৈরি হয়, যাকে কাজে লাগিয়ে যৌবনের শক্তি-সামর্থ্যকে নৈতিকভাবে প্রবাহিত করা যায়, তাকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।

আবার কারিগরি শিক্ষার সাথে technical অর্থে বিজ্ঞানের কিছু কাজ আছে। কিন্তু তাতে বিজ্ঞান শিক্ষা হচ্ছে না। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল বৈজ্ঞানিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে। পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির সমন্বয়ও বিষয়গুলির আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। জ্ঞানচর্চা যেহেতু সমগ্র মানব সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির সাধনা, আবার ব্যক্তি তার জ্ঞানচর্চাসহ সমগ্র অস্তিত্বের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল তাই মূল্যবোধ মানবিকতা সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা সাহিত্যের উপর সে কারণেই শিক্ষার একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হত। বর্তমানে শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত সিলেবাসে এই সমন্বয়কে গুরুত্বহীন করে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে তথাকথিত স্পেশালাইজেশনের কথা। যে ছাত্র বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তি অধ্যয়ন করবে এমনকি বাণিজ্যের কোন বিষয় পড়বে, তার সাহিত্য পড়ে কী হবে? ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের নীতি এরকম। অর্থাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য বাণিজ্যিক ইংরেজী, প্রযুক্তির জন্য প্রযুক্তিগত ইংরেজী শিখলেই হলো। অর্থাৎ জ্ঞান বিকাশের সুসংহত প্রক্রিয়াটিই ভীষণভাবে মার খাবে।

এই co-ordinated knowledge, যেটা এককালে বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে ছিল - জগদীশ বসু, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহার মতো বড় বড় বিজ্ঞানী তৈরি হয়েছিল, দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে দেশের মানুষ সেরকম নাম আজ আর বলতে পারছে না। এই স্ট্র্যাচারের মানুষ দেশে নেই। বলতে চাইলেও হাতড়ে হাতড়ে পাই না কিছুতেই। তাঁরা কিন্তু ভাঙাচোরা ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। আইনস্টাইন সত্যেন বোসকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার উপযুক্ত মনে করতেন। সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। গৌরববোধ থাকতে হবে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। জগদীশ বোস আমাদের বিক্রমপুরে জন্মেছিলেন। অথচ কতজন জানে এই কথা? কোনো চর্চা আছে এদেশে? পাকিস্তান আমাদের কত ক্ষতি করে দিয়েছে, আপনারা বুঝতে পারছেন? সাম্প্রদায়িক চিন্তা যদি আমাদের মাথাকে এভাবে চেপে ধরে

রাখে তাহলে আমরা কি এসব বড় মানুষকে, বড় চরিত্রকে বুঝতে পারব? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিক্রমপুরে, আজকের মুন্সিগঞ্জে জন্মেছিলেন। কোনো গৌরববোধ আছে? কিছু শিক্ষিত লোক হয়ত কষ্ট পায়, মনে করে থাকলে ভালো হত, ঠিক হত। কিন্তু নেই তো। কেন নেই? আসলে সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক চিন্তা আনবার জন্য যে প্রবল সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেটা হয়নি। সেটা না করলে এই পরিবেশ পাল্টাবে না। একটু সেক্যুলার, একটু গণতান্ত্রিক, খানিকটা ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন এরকম জগাখিচুড়ি হয়ে কি বড় কোনকিছুকে ধারণ করতে পারবেন? পারবেন না, পারবেন না। আমার উপর ক্ষেপে যাবেন না। আমি বোঝার জন্য বলছি। মনের মধ্যে হচপচ নিয়ে, পাঁচমিশালী মন নিয়ে কোনদিনই গৌরববোধ দাঁড়াবে না।

এখন আমি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলব। ১৯৮৪ সালে ছাত্রলীগের ধারা থেকে ব্রেক করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গড়ে উঠে। তখন এই সর্বজনীন-বিজ্ঞানভিত্তিক-সেক্যুলার-একইপদ্ধতির-গণতান্ত্রিক শিক্ষার শ্লোগান নিয়ে আসে। এই যে আনলো, এগুলো কথার অর্থে, শব্দের অর্থে কেউ কিছু শোনেনি একথা আমি বলছি না। কিন্তু এভাবে articulate করে, সুন্দরভাবে গুছিয়ে শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্র ফ্রন্ট-ই এনেছে। এটা আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তা থেকে পেয়েছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের একজন বিপ্লবী, ভারতের সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক সংকট-সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করে আজকের বিপ্লবী সংগ্রামের পথনির্দেশ করেছেন। তাঁরই শিক্ষা থেকে আমরা এই কথাগুলি নিয়েছিলাম।

...পুঁজিবাদ তার বাঁচার স্বার্থে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনের উপর আক্রমণ-দমনপীড়ণ নামিয়ে আনছে। কিন্তু তা দিয়ে মানুষের লড়াইকে ঠেকানো যায় না। মানুষ বার বার বিদ্রোহ করে। মানুষের বাঁচতে চাওয়াকে তো কেউ আটকে রাখতে পারবে না। ফলে একসময় দম বন্ধ হবার উপক্রম হলে আবার লড়াই করবে মানুষ। এই অন্তরঙ্গ মুক্তির আকুতি নিয়ে মানুষ লড়ে। এই মানুষকে অমানুষ, হৃদয়কে অনুভূতিহীন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের এই সর্বাত্মক আগ্রাসী বিকৃত রূপটিকে বলা হয় ফ্যাসিবাদ। এটি মনুষ্যত্বকে একদম গোড়া থেকে নষ্ট করে দিতে চায়। এখানেই নিহিত আছে সবচেয়ে ভয়াবহ সর্বনাশের আশঙ্কা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা পরিকল্পনা-পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করে এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ মানবতার চরম শত্রু হিসেবে ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একদল লোক আছেন যারা প্রশাসনের উগ্র মূর্তিটাকেই ফ্যাসিবাদ বলেন। একনায়কত্বকেই ফ্যাসিবাদ বলেন। মনে রাখা দরকার, একনায়কত্ব - মিলিটারি একনায়কত্ব হয়। একনায়কত্ব ক্যু এর দ্বারাও তৈরি হয়। অত্যাচার সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী প্রশাসন ব্যবস্থাতেই হয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা করে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ তার চেয়েও দুর্ধর্ষ। শুধু অত্যাচার একটা দেশের এত ক্ষতি করতে পারেনা। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলিকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। অর্থাৎ দেশে একদল টেকনোক্র্যাট (শিক্ষিত কারিগর) সৃষ্টি করে যারা মানবিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোন দায়বোধ নেই। তারা চাকুরিকে এবং গোলামীকেই সর্বস্ব বলে মনে করে। পয়সার বিনিময়ে যারা যা কিছু করতে পারে এবং এইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যাকে তারা প্রবাহিত করে। অপরদিকে আধ্যাত্মবাদ সেকেলে যতরকম কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা ও অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে আধ্যাত্মবাদ - তমসাচ্ছন্ন ভাবনা ধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরী বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। . . . .মনে রাখবেন, একটা জাতি না খেতে পেরেও উঠে দাঁড়ায়, না খেয়েও লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে বিশেষ কেউ থাকবেনা। কারণ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাঁধা সৃষ্টি করে।"

বন্ধুগণ, আপনাদের প্রতি আবেদন করছি, ভবিষ্যতে আপনারাই দেশের দায়িত্ব নেবেন। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে বুঝবার জ্ঞান দরকার। ...এটা বুঝতে হবে বিশ্বে পুঁজিবাদ বিকশিত হবার আর কোনো রাস্তা নেই। মনুষ্য বিধ্বংসী এই সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি, সঠিক রাজনৈতিক লাইন আয়ত্ত্ব করার জন্য আমি সমস্ত যুবক-ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

[বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী গত ২৩ সেপ্টেম্বর ১৪ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আয়োজিত শিক্ষা কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন যা 'অনুশীলন' ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেই বক্তব্যটি কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে এখানে প্রকাশ করা হলো।]

হৃদয়ে শিক্ষা চাই

—— সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-অসামান্য মূল্য দিতে হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ খুঁজব কোথায়? খুঁজতে যদি হয় তবে খুঁজতে হবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হবার যে-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্ভাবনার মধ্যে। অগ্রসর হওয়ার পথে অন্তরায় আছে অনেক, দুস্তর অন্তরায় আছে দারিদ্র্যে ও শোষণে, কিন্তু তার চেয়েও নিকটবর্তী অন্তরায় বোধ করি যথার্থ শিক্ষার অভাব।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে তিনটি; চাকুরিজীবী সৃষ্টি করা; সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক সৃষ্টি করা এবং বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ সৃষ্টি করা! দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটি পত্তন করা হয়েছিল চাকুরিজীবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে উপরিপাওনা হিসেবে সংস্কৃতিবান ভদ্রলোকও পাওয়া গেছে কিছু কিছু–চাকরি এলে ভদ্রতাও আসে, না- এসে পারে না। কিন্তু শিক্ষার তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা কতটা মিটবে; বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ এই ব্যবস্থায় তৈরি হয়েছে কিনা, হলে কয়জন হয়েছে, জিজ্ঞাসা সেটাই।

চাকুরে নয়, ভদ্রলোকও নয়, মানুষ সৃষ্টি করাই যে শিক্ষার মূল কথা হওয়া উচিত এই সত্যটা সকলেই মান্য করেন, কিন্তু ওই সত্য মান্য করা আর সত্যিকার মানুষ সৃষ্টি করা এক কথা নয়। দারিদ্র্যের যে-হৃদয়হীন বন্ধনে আমরা আটকা পড়েছি তা থেকে মুক্ত হবার জন্য আজ ভীষণভাবে দরকার কারিগরি কৌশলের; দরকার দক্ষ, কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমান মানুষের। এই প্রয়োজনের সত্যটিকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে অবশ্যই; কিন্তু রাখতে গিয়ে খেয়াল রাখা আবশ্যক হবে যাতে মুহূর্তের জন্যও চোখ ফিরিয়ে না নিই অন্য একটি সত্য থেকে। সেটি হলো এই যে, কৌশলজ্ঞান, দক্ষতা, কর্মনিপুণতা এ সকল ব্যাপার চালু রাখার ব্যাপার, সৃষ্টিশীলতার ব্যাপার নয়।

...কিন্তু শুধু সৃষ্টি নয়, হৃদয়ের চর্চার মধ্য দিয়ে একাকিত্বের বোধ কেটে যায় মানুষের। এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের মমত্ব যখন গড়ে ওঠে তখন আর আমরা ক্ষুদ্র থাকি না, সামান্য থাকি না–তখন ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, বৃহৎ হয়ে পড়ি। তখন শুধু মানুষ নয়, যুক্ত হই প্রতিপার্শ্বের সঙ্গেও। যখন বুঝি আমরা একা নই তখন হতাশা আসে না সহজে, বিষণ্নতা আসে না স্বল্পসুযোগে। মানুষ স্বার্থপর প্রাণী তদুপরি শিক্ষিত মানুষ মানেই বিচ্ছিন্ন মানুষ, কেননা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম হয় মানুষে মানুষে দূরত্বটাও তত প্রবল হয়ে ওঠে। (আমরা যখন অসন্তুষ্ট হই কারো ভাবগতিক দেখে তখন দেখা যায় ঠিক চিনেছি বুদ্ধির কাজকে। আমরা বলি 'কে বুদ্ধি দিয়েছে শুনি?' বলে চেপে ধরতে চাই বুদ্ধির কুটিলতাকে।) এই বাংলাদেশে মানুষে মানুষে দূরত্ব সৃষ্টির কাজে যত কায়দাকৌশল চালু আছে, অন্য কোনো কিছু সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন আছে বলে মনে হয় না। বিচ্ছিন্নতার জায়গা মিলনকে প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ের পরিচর্যা করা খুব বেশি করে প্রয়োজন।

যাকে আমরা বিবেক বলি তা অশরীরী কোনো বস্তু নয়। শোপেনহাওয়ারের কথাটা বার বার স্মরণযোগ্য, 'মানব-হৃদয়ে গভীররূপে প্রোথিত করুণাই হচ্ছে নৈতিকতার একমাত্র যথার্থ ভিত্তিভূমি।' বিবেকের সত্যিকারের আশ্রয়কে পাওয়া যাবে না আধিদৈবিক অনুশাসনে অথবা নীতিজ্ঞানের হট্টগোলে, পাওয়া যাবে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধে। ওয়েগনার ও হিটলার উভয়েই জার্মান ছিলেন, ছিলেন উভয়ে নিরামিশভোজী, কিন্তু একজন যে শিল্পী হলেন অন্যজন নিপীড়নকারী তার কারণ তাঁদের একজনের হৃদয়ে মমতা ছিল, অন্যজনের হৃদয়ে তা ছিল না। সমাজের মধ্যে যদি সাম্যের প্রতিষ্ঠা চাই আমরা

তবে সে-সাম্য আনতে পারব না পুলিশের লাঠির সাহায্যে, তাকে আনতে হবে বিবেকের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল বিবেকের নিয়ন্ত্রণকে সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। এই নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করবার ব্যাপারে উদ্যমশীল হওয়া প্রয়োজন আজ ভীষণভাবে। বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সাহায্যে মানুষকে উত্তেজিত করা কঠিন নয়, হিংসা থেকে হিংস্র হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু শুধু উত্তেজনা ও হিংসার মধ্য দিয়ে মহৎ কাজ সংগঠিত করা সহজ নয়, সমাজবিপ্লবও নয়। সমাজবিপ্লব কেন চাই? চাই মানুষকে ভালোবাসি বলে। ভালোবাসার কারণে, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এমন বিপ্লব চাই আমরা যার প্লাবনে সব রকমের শোষণ ও অত্যাচার অপসারিত হতে পারে সমাজ থেকে।

...বাংলা নাটকে বাস্তবতা সৃষ্টির সমস্যার কথা বলতে গিয়ে মধুসূদন মন্তব্য করেছিলেন, 'আমরা বাস্তবকে ভুলিয়া পরীর স্বপ্নে বিভোর।' বাস্তবে এই অবজ্ঞা এই স্বপ্নে এই বিভোরতা শুধু আমাদের সাহিত্যের নাটকে নয়, জীবনের নাটকেও সত্য। এই অর্থে আমরা হৃদয়বান বটে। কিন্তু এ হৃদয় কোন হৃদয়? নিশ্চয়ই শিক্ষিত, মার্জিত, পরিশীলিত হৃদয় নয়। অকারণ ভাবাবেগ, অতিরিক্ত অন্যমনস্কতা বা উদাসীনতা– এটা হৃদয়ের অশিক্ষার লক্ষণ, অন্য কিছুর নয়। প্লীহা রোগীর আতিকায় প্লীহা যেমন স্বাস্থ্যের প্রমাণ দেয় না, অকারণে উত্তেজিত বা অহেতুক অস্থির হৃদয় তেমনি দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন মানুষকে তার পুরাতন বন্ধন থেকে মুক্ত করা। যে-হৃদয় পুষ্ট নয়, সে হৃদয় পুষ্ট করে শুধু বন্ধনকে। বন্ধন কিসের? বন্ধন কুসংস্কারের, অন্ধবিশ্বাসের, বন্ধন ভয়ের। আবদ্ধ হৃদয় পঙ্গু হয়ে পড়ে আপনা থেকেই। আশঙ্কা থাকে আবদ্ধ অবস্থাতেই তার স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে হঠাৎ একদিন। অশিক্ষিত হৃদয় অতিসহজে উত্তেজিত হয়–প্রচণ্ডরূপে। তার অশ্রুপাতে সৃজনের উপাদানেরা ভিজে ভিজে ওঠে, ফলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টিতে। অশিক্ষিত হৃদয় ক্রীড়নক হয়ে পড়ে অন্যের হাতের, প্রবল কোনো বায়ুপ্রবাহের আয়োজন ঘটলে সে মাথা নুইয়ে দেয়, এপাশে-ওপাশে। পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকাই যদি, পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের দিকেও–দেখব কত সহজে প্রতারিত হয়েছে আমাদের হৃদয়, স্বীয়স্বার্থসিদ্ধকারী মানুষের হাতে। হৃদয়কে তাই শক্ত হতে জানতে হবে, কোমল হতে জানার সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্য পরিবর্তনের দুর্বার ইচ্ছাশক্তির উৎসমুখ একটাই, শিক্ষিত হৃদয়। অশিক্ষার কদর্যে ক্ষতি আছে, লাভ নেই।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি চাই, ভাগ্য পরিবর্তনের বিপুল-প্রবল উদ্যম, আর সেই জন্যই হৃদয়ের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চাই বুদ্ধির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, যাতে করে অনুভব ও ধারণা, আবেগ ও জ্ঞান, কল্পনা, বুদ্ধি একত্রে কাজ করতে পারে, যাতে করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের সুবর্ণসংযোগে আমরা নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি সবল ও সমর্থ পদক্ষেপে। পানির প্রবল স্রোতকে বশ করে যেমন আমরা বিদ্যুৎশক্তি এনেছি, তেমনি করে আবেগ থেকে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা আনতে হবে, নইলে বন্যা আসবে দুর্গতিকে মাথায় নিয়ে।

...তথাকথিত আদর্শবাদের আমরা বিস্তর প্রশংসা করি, কিন্তু এই আদর্শবাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার যদি থাকে তবে সেই আদর্শবাদে হৃদয়ের উপকার হয় না, অপকার ভিন্ন। আমাদের দেশে হৃদয়কে অবজ্ঞা করবার অভ্যাস অতিশয় পুরাতন। শুধু অবজ্ঞা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই ব্যবস্থা আছে অতিশৈশবে আমাদের হৃদয়কে ক্ষীণপ্রাণ করবার। শিশুকে আমরা প্রায় কখনোই শিশু হিসেবে বিবেচনা করি না। শিশু যাতে শৈশবে শিশু থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দার্শনিক রুশো দিয়েছেন, পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছে, আমরা পারিনি। শিশুর জগত কাঁচের চেয়েও ভঙ্গুর। এই অতিভঙ্গুর জগতের উপর সমাজ ও সংসারের দোর্দণ্ড প্রতাপেরা এমন বিক্রমে ও নিষ্ঠুরতায় ঘা দিতে থাকে যে জগতটা ভেঙে খান খান হয়ে যায় অচিরে, আনন্দ ও কল্পনার মূল্যবান উপকরণগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে এখানে সেখানে। শত বছরের বঞ্চনা ও দুর্গতির বোঝা শিশুর দুর্বল হৃদয়ের উপর চেপে বসে–দয়ামায়া না করে। পিতামাতার দুর্বহ দুঃখ, সংসারের দুঃসহ বীভৎসতা, চারপাশের মর্মভেদী ক্রন্দন–এইসবের শক্ত বোঝা বইতে গিয়ে সামান্য শিশুর ছোট্ট হৃদয়টি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। হৃদয়ের বাকি জীবনটা কাটে পঙ্গুত্বের ভেতরই। জীবন মানে তখন ক্ষয়রোগীর মতো ধুঁকতে থাকা, ধুঁকতে ধুঁকতে অকালমৃত্যুর দিকে এগুতে থাকা, যতটা পারা যায় বিলম্বিত করা অন্তিম মুহূর্তের আগমনকে। হৃদয়হীন সংসার হৃদরোগের খোঁজও করে না। অথচ হৃদরোগই আসল রোগ, ব্যক্তির জীবনে যেমন সমাজের জীবনেও তেমনি। সংসারে যাদের অনেক আছে তাদের সন্তানেরা আদর-যত্ন যথেষ্ট পায়, দেহের খাদ্য পায় প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু সেখানেও শিশুর শৈশব মারা যায় শৈশবেই। দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্কদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার চাপে সেখানেও শিশু তার সারল্যকে রক্ষা করতে পারছে না কোনোমতেই। বাস্তুহারা শিশু আশ্রয় খুঁজছে বয়স্কদের স্বাস্থ্যহীন জগতে।

ফলে প্রায় কোনো শিশুই শিশু থাকে না শৈশবে; বয়স্ক মানুষের অপ্রাপ্তবয়স্ক সংস্করণ হয়ে ওঠে, প্রাপ্তবয়স্কদের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা, ঘৃণা ও ভয় তার ভেতরটাকে লোলচর্ম বৃদ্ধে পরিণত করে। বয়স যখন বাড়ে তখন এই নিরীহ ও অপমানিত শৈশব স্বভাবই বড় রকমের প্রতিশোধ নেয় প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনের নানান জায়গায় হানা দিয়ে সে যখন তখন, যা তা উৎপাত উপদ্রবের সৃষ্টি করে। এই জন্যই বয়স্ক শিশুর এত বেশি প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে। যতই চেষ্টা করুক শিক্ষাব্যবস্থা কিছুতেই পরিণত, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তৈরি করে উঠতে পারে না। গলদ থেকে যায় একেবারে গোড়াতেই। নাজুক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তির উপর উচ্চশিক্ষার যে নিতান্ত নড়বড়ে ব্যবস্থাটি আমরা গড়ে তুলেছি তা খুব একটা কাজে লাগে না; তার চেয়েও বড় কথা সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার সব মহল ঘুরে এসেও প্রাণের খোঁজ পাওয়া যায় না।

...শিক্ষা তো শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়, ব্যাপার পরিবার ও সমাজেরও। সমাজই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে সবকিছুকে। শিক্ষক যখন পড়াতে বাধ্য হন যে, রাজনীতি মহাপাপ, তখন দেখা যায় যে সমাজে কল্যাণকর পরিবর্তন যা আসছে তা ঐ মহাপাপের পথ ধরেই। শিক্ষা ও সমাজের মাঝখানে এই রকমের ফাঁক থাকলে সেই ফাঁকে শিক্ষাদানের সমুদ্দেশ্য তলিয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে আবার এও সত্য যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ফলপ্রসু করার জন্য সমাজের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া আবশ্যক। সমাজ যদি মানুষে মানুষে অসাম্য শেখায় তাহলে বিদ্যালয়ে সাম্যের শিক্ষা পত্তনের আগে প্রয়োজন হবে সামাজিক কুশিক্ষার দুষ্ট চারা উপড়ে ফেলা। এটা একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। চারুকলা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে একবার তাঁর দায়িত্বের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, ছাত্রদের আঁকতে শেখানোর আগে তাঁর কাজ হয় যে-ভুল আঁকা তারা বাইরে থেকে শিখেছে সেটা ভুলতে শেখানো। এই দায়িত্বটা সকল শিক্ষকেরই। সমাজ প্রতিনিয়ত ভুল শিক্ষা দিচ্ছে, বিশেষ করে হৃদয়কে-শিক্ষা দিচ্ছে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, ভীতি।

আমরা বলি শিক্ষকরা আদর্শ নাগরিক তৈরি করবেন। কথাটার তাৎপর্য বিবেচনা করে দেখবার মতো। আদর্শ নাগরিক বলতে আমরা বুঝি যোগ্য, দক্ষ, প্রশংসাভাজন মানুষ। অর্থাৎ কিনা এমন মানুষ যার সঙ্গে সমাজের কোনো বিরোধ বাধবে না, সমাজের ব্যবস্থাটাকে যে মেনে নেবে, মেনে নিয়ে খারাপ স্কুলের ভালো ছাত্রের মতো দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে। তাই এ কথা বলা দরকার যে এটা পর্যাপ্ত নয়। আমরা শুধু আদর্শ নাগরিক চাই না, চাই উপযুক্ত মানুষও। ...মানুষের অভাব বলেই কেবল নাগরিকদের দিয়ে কাজ হবে না। এমন মানুষ চাই যার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সুশিক্ষা ঘটেছে হৃদয়ের, যার জ্ঞান আছে আর আছে প্রয়োজন হলে সাহস-একা দাঁড়াবার।

মস্তিষ্কের কথা, বুদ্ধির কথা অনেক শোনা গেছে, আরো শোনা যাবে, যাবেই; সেই জন্যই অবহেলিত ও অশিক্ষায় জর্জরিত হৃদয়ের কথা বলতে হবে জোর দিয়ে।

[রচনাটি সিরাজুল ইসলাম চৌধরীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (কথা প্রকাশ প্রকাশিত) থেকে সংকলিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে ছাপানো হলো]

তরুণের বিদ্রোহ

——— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুগণ,

নিজের জীবন এলো যখন সমাপ্তির দিকে, তখন ডাক পড়লো আমার দেশের এই যৌবন-শক্তিকে সম্বোধন ক'রে তাদের যাত্রাপথের সন্ধান দিতে। নিজের মধ্যে কর্মশক্তি যখন নিঃশেষিত প্রায়, উদ্যম ক্লান্ত, প্রেরণা ক্ষীণ, তখন তরুণের অপরিমেয় প্রাণধারার দিক-নির্ণয়ের ভার পড়লো এক বৃদ্ধের উপর। এ আহ্বানে সাড়া দিবার শক্তি-সামর্থ্য নেই, সময় গেছে। এ আহ্বানে বুকের মধ্যে শুধু বেদনার সঞ্চার করে। মনে হয়, একদিন আমারও সবই ছিল যৌবন, শক্তি, স্বাস্থ্য, সকলের কাজে আপনাকে মিশিয়ে দেবার আনন্দবোধ এই যুবসংঘের প্রত্যেকটি ছেলের মতই, কিন্তু সে বহুদিন পূর্বেকার কথা। সেদিন জীবন-গ্রন্থের যে-সকল অধ্যায় ঔদাস্য ও অবহেলায় পড়িনি, এই প্রত্যাসন্ন পরীক্ষার কালে তার নিষ্ফলতার সান্ত্বনা আজ কোন দিকেই চেয়ে আমার চোখে পড়ে না। আমি জানি, এই তরুণ-সংঘকে জোর ক'রে বলবার কোন সঞ্চয়ই আমার নেই। তাদের পথ-নির্দেশের গুরুতর দায়িত্ব আমার সাজে না; সে কল্পনাও আমি করিনে। আমি কেবল গুটি-কয়েক বহুপরিচিত পুরাতন কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি।

পেশা আমার সাহিত্য; রাজনীতি-চর্চা হয়ত আমার অনধিকার চর্চা, এ কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরও একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, সে আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে। আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোন দিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর ক'রে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা। জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ; বর্তমান কালে কোন্ পরিবর্তন উপযোগী, এবং কোনটার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্তমনে বিদায় নিয়েছি; আজকে এই কয় ছত্র লেখার মধ্যেও তার অন্যথা করিনি। এখানেও সেই সমস্যা আছে, তার জবাব নেই। কারণ জবাব দেবার ভার বাঙ্গালার তরুণ-সংঘের, এ বৃদ্ধের নয়। সেইটাই এই অভিভাষণের বড় কথা।

. . . আমার বক্তব্য নীরস, অনেকের কানে হয়ত কটু শোনাবে; শব্দাড়ম্বরের ঘটায় বচন-বিন্যাসের কৌশলে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে আমি আমি। কিন্তু তোমরা ত জান, সোজা কথা সোজাভাবে বলাই আমার স্বভাব। কারও বিরুদ্ধে কতগুলো কঠোর অভিযোগ করতেও আমি নারাজ, তাই আমার কথার মধ্যে তেমন স্বাদ নেই, এ আমি নিজেই অনুভব করি। কিন্তু ভরসা এই যে, রাষ্ট্রীয় সম্মিলন আসন্ন প্রায়। নেতারা অনেকে এসে পড়েছেন; বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরাও এলেন বলে। বক্তৃতা শুনে তোমাদের ক্ষুধা মিটবে। ইংরাজ-রাজত্বের দেড় শো বছরের ইতিহাস তাঁদের কণ্ঠস্থ। ইংরেজ, তুমি এই করেছ, এই করেছ, এই করেছ, এই করনি, এই করনি, এই করনি, অমুককে লাঠি মেরে খুন করছ, অমুককে বিনাবিচারে আটক করেছ, চা-বাগানের অমুক সাহেবকে ছেড়ে দিয়েছ, অতএব তোমার রাজ্য শয়তানের। এমনি অত্যাচারের ধারাবাহিক ফর্দ দিয়ে জগতের কাছে তাঁদের নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করতে হয় যে, ইংরেজ-শাসনপ্রণালী অতিশয় মন্দ এবং তার চাপে আমরা আর বাঁচিনে। সুতরাং হয় আইনকানুন বদলাক, নয় এর সঙ্গে আমরা আর কোন সংস্রব রাখব না। এ-সকলের যে প্রয়োজন নেই তা আমি বলিনে, বরঞ্চ বোধ করি বেশী প্রয়োজনই আছে। কিন্তু প্রয়োজন যতই থাক, এইখানেই উভয় প্রতিষ্ঠানের মনস্তত্ত্বের গভীর ব্যবধান। কারণ শয়তানের রাজ্য কিনা এ সপ্রমাণ করার দায়িত্ব যুব-সমিতির নেই। তাদের

জিজ্ঞাসা করলে তারা এই উত্তরই দেবে যে, বিদেশীর শাসনপ্রণালী যা হয় তাই। কংগ্রেসের সম্মিলিত ধিক্কারে লজ্জিত হয়ে তারা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবে কি না, সে তারাই জানে, কিন্তু আমরা জানি তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। স্বাধীনতার বিনিময়ে পরাধীন স্বর্গরাজ্যও দেশের যৌবনশক্তি কোনদিন প্রার্থনা করবে না।

কিন্তু স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নামমাত্রই ত নয়! দাতার দক্ষিণহস্তের দানেই ত একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না, এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না। সেই অর্গল মুক্ত করার দিন এসেছে। কোনক্রমেই আর বিলম্ব করা চলে না। কি মানুষের জীবনে, কি দেশের জীবনে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ যখন শূন্য দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে, তখন কিছু না জেনেও যেন জানা যায় সর্বনাশ অত্যন্ত নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র পল্লীর অতিক্ষুদ্র নরনারীর মুখের পরেও আমি তার আভাস দেখতে পাই। চারিদিকে দুর্বিষহ অভাবের মধ্যে কেমন করে যেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছে এদেশে এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই, দুর্নিবার মরণ তাদের গ্রাস করলে বলে।

এদের বাঁচাবার ভার তোমাদের। এ ভার কি তোমরা নেবে না? জগতের দিকে দিকে চেয়ে দেখ এ বোঝা কে বয়েছে। তোমরাই ত! শুধু এদেশেই কি তার ব্যতিক্রম হবে? শান্তি-স্বস্তিহীন সম্মানবর্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এতবড় লোভের বস্তু? দেশকে কি বাঁচায় বুড়োরা? ইতিহাস পড়ে দেখ। তরুণ-শক্তি নিজের মৃত্যু দিয়ে দেশে দেশে কালে কালে জন্মভূমিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে গেছে। এ সত্ত্বেও যদি তোমরা ভোলো, তবে এ সমিতি গঠনের তোমাদের লেশমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায় সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যে তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়। যারা মনে করে, জগতে আর সব-কিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই কিছু চাই না, ওটা শুরু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত-কিছুই জানুক, বিপ্লব-তত্ত্বের কোন সংবাদ জানে না। মনে মনে যাঁরা বিপ্লবপন্থী, আমার কথায় হয়ত তাঁরা খুশী হবেন না। কিন্তু আমি গোড়ায় বলে রেখেছি, খুশী করার জন্য এখানে আসি নাই। এসেছি সত্য কথা সোজা করে বলবার জন্যে।

আমরা কতদিকেই না নিরুপায়! অনেকে বলেন, বিদেশী রাজশক্তি আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে একেবারে অমানুষ করে রেখেছে। অভিযোগ যে অসত্য তা আমি বলিনে, কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? অস্ত্রশস্ত্র আজই না হয় নেই, কিন্তু হাজার বছর ধরে করেছিলাম কি? তখন ত Arms Act জারি হয়নি! সবচেয়ে বেশী নিরুপায় করেছে, আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আত্মকলহ। তাই বার বার মোগল-পাঠান-ইংরাজের পায়ে আমাদের মাথা মুড়ানো গেছে। পৃথিবীর সমস্তশক্তিমান জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আত্মকলহ তাদের মধ্যে থাকে না যে তা নয়, কিন্তু বহিঃশত্রুর সম্মুখে সে কলহ তারা স্থগিত রাখতে জানে। শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাভূত না করা পর্যন্ত তারা কিছুতেই ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হয় না। এই তাদের সবচেয়ে বড় জোর। কিন্তু আমাদের? জয়চাঁদ, পৃথ্বিরাজ থেকে শুরু করে সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফরেও এই মজ্জাগত অভিশাপ আর ঘুচল না।

...আগেকার দিনে দিগ্বিজয়ের গৌরব অর্জন করার জন্যে প্রধানতঃ রাজারা রাজ্যজয়ে বার হতেন, কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে। এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জন-কয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিক্-বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষণের জন্যেই শাসন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দশ-পনের বছর পূর্বে যে জগৎ-ব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ এক কথা, ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদারের কাড়াকাড়ি।

... আর একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত, মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কমিয়ে আনা দরকার। অভাব-বোধই দুঃখ।

অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কাপড় এবং পাঁচ হাতের বদলে কৌপীন পরিধান এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ, সেই হেতু সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব-বিকাশের সর্বোত্তম উপায়। এই পুণ্যভূমি ত্যাগ-মাহাত্ম্যেই ভরপুর। উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, এই ত্যাগের মন্ত্র দিনের পর দিন সর্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা করবে কি, অভাব-বোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোট জাত অস্পৃশ্য, তাতে কি? ভগবান করেছেন! একবেলার বেশী অন্ন জোটে না, কপালের লেখা! এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা আর একটু বেশী জানে, তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে, সংসার ত মায়া, দু'দিনের খেলা; এ-জন্মে সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখ সয়ে গেলে আর-জন্মে মুখ তুলে চাবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পরে অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখ বোজে।

একটা কথা পুরানো-পন্থীদের মুখে দুঃখ করে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, সেকালে এমনটি ছিল না। এখন চাষারা পর্যন্ত জামা পরে, পায়ে জুতো দিতে চায়, মাথায় ছাতা ধরে, তাদের মেয়েরা গায়ে সাবান মাখে, বাবুয়ানিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। প্রত্যুত্তরে তাদের এই কথাই তোমাদের বলা চাই যে, এই যদি সত্য হয় ত আনন্দের কথা। দেশ উচ্ছন্ন না গিয়ে উন্নতির দিকে মুখ ফিরিয়েছে, তারই আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ যত চায়, ততই তার পাবার শক্তি বাড়ে। অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা তাকে স্বীকার করে তার গোলামি করাটাই কাপুরুষতা। একদিন যা ছিল না, তাকে অহেতুক বাবুয়ানি বলে ধিক্কার দিয়ে বেড়ানোই দেশের কল্যাণ কামনা নয়।

...অনেক সময় নিলাম। অভিভাষণটা হয়তো অযথা দীর্ঘ হয়ে গেল। পরিশেষে একটা কথা বলে শেষ করব, দেশে শিক্ষাবিস্তারের কথা। যে শিক্ষা সভ্যজগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষা-বিস্তার গভর্নমেন্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না। করতে মানা আমি করিনে, কিন্তু এখানে একটা night school, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর। তা সে যাই হোক, লেখাপড়া ছাড়া তার অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এ কথা যাঁরা বলেন যে, দেশের সবাই লেখাপড়া না শেখা পর্যন্ত আর গতি নেই, মুক্তির দ্বার আমাদের একান্ত অবরুদ্ধ, এবং এইজন্যে সকল কর্ম পরিত্যাগ করে লেখাপড়া শেখান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের পরে আমার ভরসা কম। এইবার শেষ করি।

[১৯২৯ সালের ঈস্টারের ছুটিতে, রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর আগে, বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতির আসন থেকে প্রদত্ত বক্তৃতা।]

ভিক্ষা দাও

—— কাজী নজরুল ইসলাম

ভিক্ষা দাও! পুরবাসী ভিক্ষা দাও। তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও। আমাদের এমন একটি ছেলে দাও, যে বলবে আমি ঘরের নই, আমি দেশের।

ওগো তোমরা চেয়ে দেখ সর্বনাশ আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কোটি কোটি লোক দুমুঠো ভাতের জন্য হা হা করে ছুটছে। ওগো ঐ দেখো কোটি কোটি ভাই আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বুকে হাত দিয়ে দেখ সেখানে আর প্রাণ নাই, তোমাদের হৃদয়ে অনুভব করে দেখ সেখানে আর বল নাই। ওগো বলি চাই। বলি চাই। তোমাদের একটি ছেলে বলি চাই।

ওগো সংসারী। কোথা যাও। তুমি কি সুখ পেয়েছ? পদে পদে অভাব আর অধীনতায় আহত হয়ে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পেয়েছ? ওগো! তুমি ত শান্তি পাবে না। তুমি তো যুদ্ধে তোমার ছেলে দাও নাই। ওগো ভিক্ষা দাও, একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও।

ওগো পূজারী কোথায় অর্ঘ্য দিতে চলেছ? বুকে বুকে দেবতার তপ্ত শ্বাস হু হু করে বয়ে যায়–তুমি কার কাছে ডালি নিয়ে যাও। ও কী নিয়ে যাচ্ছ তুমি! ফুল আর পাতায় তোমার দেবতা কি তুষ্ট হবেন? বুকে তার তীব্র জ্বালা চোখে তার হিংস্র বহ্নি। ওগো সে তো ফুল পাতা চায় না, সে চায় কাঁচা তাজা প্রাণ। ওগো বলি দাও– বলি দাও।

ওরে তরুণের দল! একবার ফিরে দাঁড়াও।

কোথা যাও অন্ধের মত, কোথায় চলেছ তোমরা? ঐ যে চাষীর শত শত রক্ত-প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে তাদের দলিত করে কোন উন্নতির দিকে ছুটে চলেছ? তোমার বুকের ভিতর যে দেবতা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে তার কণ্ঠরোধ করে কোন মায়াবীপুরের দিকে চলেছ? কান পেতে শোন কাদের কান্নার ধ্বনি আকাশে পাতালে ধ্বনিত হচ্ছে। তোমরা কি তোমাদের অলস বাঁশি দূর করে দেবে না? চোখ মেলে দেখ, সব গেল, সব গেল। তিল তিল করে সব যে শেষ হয়ে গেল। ওগো তরুণের দল, তোমাদের ভিতর কি এমন লক্ষ্মীছাড়া কেউ নেই– যে বলে, আমি তিল তিল করে বাঁচবো না। আমি ঘরের মায়ায় ভুলব না, ঘর আমার স্থান নয়, ঐ কাঁটাবন আমার ঘর, দুঃখ দারিদ্র আমার সম্পত্তি, মৃত্যু আমার পুরস্কার। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন নেই– যে এই ভীষণ আঁধারে নিজের বুকের আগুন জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়? তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই– যে বলতে পারে আমি আছি, সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি, যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্য পাত করব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও, তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।

ওরে তরুণের দল! একবার বুকে হাত দিয়ে বল দেখি একবারও কি এ নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়নি? একবারও কি এই জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে ইচ্ছা হয়নি? ওরে ওঠ, ওরে তোরা ওঠ, দূর করে দে জড়তা, ছিঁড়ে ফেলে দে বন্ধন। হৃদয় থেকে কোমলতা দূর করে দে। শয়তানের হিংসা নিয়ে শত্রুর পানে একবার ছুটে চল। বিশ্বের গরল প্রাণে ঢেলে দে। তোরা বিশ্বময় বিষ ছড়িয়ে দে, সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাক। অত্যাচার ! অত্যাচার ঐ দেখ অত্যাচার কী ভীষণ মূর্তি ধরে বসেছে। ধনী তার ধন নিয়ে, বলবান তার লাঠি নিয়ে, কাজী আর পণ্ডিত তার শাস্ত্র দিয়ে মানুষ হত্যা করার কী ভীষণ চেষ্টা করছে। ঐ শোন তাদের তাণ্ডব চিৎকার। ঐ দেখ কী বিকট মূর্তি।

কে আছ বীর, তার টুঁটি ধরে মারতে পারো। কে আছ, দুঃসাহসী, তার সহস্র ফণা নিয়ে খেলতে পারো। কে আছ নাস্তিক, কে আছ হিংসুক, কে আছ বিদ্রোহী, এসো। কে আছ তরুণ, কে আছ পাগল, ভিক্ষা দাও, তোমার মাতাল প্রাণটি ভিক্ষা দাও।

প্রতিটি বিপ্লবীর ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম ও বিজয় বিপ্লবী সংগ্রামের অমূল্য সম্পদ

ভগৎ সিং

আমরা চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এরই অবিচ্ছেদ্য প্রাথমিক কাজ হলো রাজনৈতিক বিপ্লব সফল করা, তাই-ই আমরা করতে চাই। রাজনৈতিক বিপ্লব মানে শুধুমাত্র ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্র (অর্থাৎ ক্ষমতা) হস্তান্তর করা বোঝায় না। আমাদের মতো সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী লক্ষ্য আছে এমন ভারতীয়দের হাতে অর্থাৎ জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে বিপ্লবী দলের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসা চাই। তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে গোটা সমাজকে পুনর্গঠিত করার পথে সংগঠিতভাবে আমাদের এগোতে হবে। বিপ্লবের এই সঠিক ধারণা যদি আপনার না থাকে তবে দয়া করে থামুন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানটি তুলবেন না। অন্ততঃ আমাদের কাছে 'বিপ্লব' শব্দটির তাৎপর্য সুমহান। এ শব্দটিকে যেমন তেমন করে ব্যবহার করতে বা অপব্যবহার করতে দিতে আমরা পারি না। জাতীয় বিপ্লবই হোক আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হোক, যেকোন বিপ্লবের জন্যই একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি হল কৃষক এবং শ্রমিক।....যদি কেউ বলেন তাঁরা শ্রমিক কৃষকের কাছে যাবেন এবং তাদের সক্রিয় সমর্থন সংগ্রহ করবেন, তাহলে আমি বলবো এ ধরনের ভালো ভালো কথায় দেশের শ্রমিক কৃষক বোকা বনে যেতে চাইবে না। তাঁরা প্রশ্ন তুলবে, যে ধরনের বিপ্লবের জন্য ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান তাদের কাছে রাখা হচ্ছে, সেই বিপ্লব তাদের জন্য কী এনে দেবে। ভারত সরকারের সর্বোচ্চ গদীতে লর্ড রেডিং-ই থাকুন আর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসই থাকুন, লর্ড আরউইনের পরিবর্তে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুই আসুন, তাতে দেশের শ্রমিক কৃষকের জীবনে কী পরিবর্তন আসবে! তাই শ্রমিক কৃষকের জাতীয় চেতনার কাছে নিছক আবেদন করা নিরর্থক। আপনার স্বার্থে তাকে 'কাজে' লাগানোর চেষ্টা করা বৃথা। আপনাকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের বোঝাতে হবে বিপ্লবটা তারও বিপ্লব, তারই কল্যাণের জন্য বিপ্লব। এ বিপ্লব সর্বহারার স্বার্থে সর্বহারাদের নিজস্ব বিপ্লব।

বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। নিছক একজনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিপ্লব হতে পারে না, কোন একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়ে সেই দিন বিপ্লব করাও সম্ভব নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ এক পরিবেশেই আসে বিপ্লব। বিপ্লবী দলের কাজ হল বিশেষ পরিবেশে তেমন একটি বিশেষ মুহূর্তকে কাজে লাগানো। বিপ্লবের জন্য শক্তি সমাবেশ ঘটানো এবং বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই জন্য বিপ্লবী কর্মীদের অপরিসীম আত্মত্যাগ প্রয়োজন।... সান্ধ্য অবকাশে কিছু ভাষণ দেবার মত নেতা আমাদের অনেক আছে, এসব নেতাদের কোনো মূল্যই নেই। লেনিন যাকে বলেছেন 'জাত বিপ্লবী', তেমন ধরনের নেতা আমাদের চাই। আমাদের চাই এমন সব সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী, বিপ্লব ছাড়া আর কোনো আকাঙ্ক্ষা, বিপ্লবের জন্য কাজ ছাড়া আর কোন কাজ যাদের নেই। দলে এমন ধরনের কর্মী যত বেশি সংখ্যায় পাওয়া যাবে, সাফল্যের সম্ভাবনা ততই বাড়তে থাকবে।...দলের জন্য যে ধরনের কর্মী চাই তা একমাত্র যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পাওয়া সম্ভব। তাই যুব আন্দোলন গড়ে তোলা দিয়েই আমাদের কর্মসূচী শুরু হওয়া উচিত। যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্টাডি সার্কেল, ক্লাস লেকচার, লিফলেট, প্রচার পুস্তিকা, পুস্তক ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কর্মী রিক্রুট করা যাবে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের ট্রেনিং হবে।

...রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াই শ্রমিক কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব–এই অসম্ভব ধারণা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি প্রচার করে থাকেন। এরা হলেন ভ্রান্ত বুদ্ধি এবং বাক্যবাগীশের দল। এদের এই ধারণা কাল্পনিক এবং অযৌক্তিক। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা চাই এবং সেই জন্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। প্রথম দিকে শোষিত শ্রেণীর আর্থিক দাবিদাওয়া ও কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য আমাদের লড়তে হবে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যই এই লড়াই চালাতে হবে।

---এই পথে কাজ শুরু করতে হলে ধৈর্যশীল হতে হবে।... তিলে তিলে আপনাকে এগুতে হবে, এজন্য প্রয়োজন অদম্য সাহস, অধ্যবসায় এবং কঠোর সংকল্প। কোনো বাধা, কোনো প্রতিবন্ধকতা যেন আপনাদের নিরুৎসাহিত করতে না পারে। কোনো ব্যর্থতা কোনো বিশ্বাসঘাতকতা যেন আপনাদের হতোদ্যম করতে না পারে। ...অসীম সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের অগ্নি পরীক্ষার পর আসবে অনিবার্য বিজয়। প্রতিটি বিপ্লবীর ব্যক্তিগত জীবন সংগ্রাম ও বিজয় বিপ্লবী সংগ্রামের অমূল্য সম্পদ।■

তোমাদের জন্য রেখে গেলাম একটি সোনালী স্বপ্ন

সূর্য সেন

আমার শেষ বাণী– আদর্শ ও একতা।

ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করার সময়। হারানো দিনগুলোতে নূতন করে স্মরণ করার সময়।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি: আমার বৈচিত্রহীন (কারাগৃহের) জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে কী রেখে গেলাম? রেখে যাবার মত একটি জিনিষই আমার আছে, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কী পবিত্রই না ছিল সেই মুহূর্তটি, যখন প্রথম আমি সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম। তারপর সারাজীবন প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে জগতের আর সব কিছু ভুলে ক্লান্তিহীন আমি ছুটে চলেছি। জানিনা, আরদ্ধ কাজ সফল করার পথে কতটা এগিয়ে যেতে পারলাম। জানিনা, সেই পথের কোনখানে এসে আজ আমায় থেমে যেতে বাধ্য করা হল। যদি লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে মৃত্যুর শীতল হাত তোমাকে স্পর্শ করে তবে আরদ্ধ কাজের দায়িত্ব তোমার উত্তরসূরীদের হাতে অর্পণ করো, যেমন আমি করে গেলাম। এগিয়ে চলো কমরেড়, সামনে এগিয়ে চলো, পিছিয়ে প'ড়ো না, মুহূর্তের জন্যও না। দাসত্বের কাল অবসান হয়ে এলো, স্বাধীন প্রভাতের অভ্যুদয় আসন্ন। ওঠো, জাগো, কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ো। উদ্যম হারিও না। নিশ্চিত জয় তোমাদেরই। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, ইস্টার বিদ্রোহের দিন, সেদিনের চট্টগ্রামকে তোমরা ভুলো না। জালালাবাদ, জুলুধা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের স্মৃতি তোমাদের মনে চির অম্লান করে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যেসব শহীদ আত্মবলিদান করেছেন তাঁদের নাম রক্তাক্ষরে লিখে রেখো তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

তোমাদের কাছে আমার ঐকান্তিক আবেদন, আমাদের সংগঠনের মধ্যে যেন কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়। কারাগারের ভেতরের ও বাইরের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
বন্দে মাতরম!

চট্টগ্রাম জেল
১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৪

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মুখপত্র

অনুশীলন

Bonoful add

Danish®

PARTEXSTAR™ GROUP
legacy, with a new face forward

Web : www.partexstargroup.com

Northern (Pvt.) Medical College & Hospital

Medical East Area, Dhap, Rangpur.
Cell Phone : 01760-621434 E-mail principalnpmc@gmail.com
Land Phone : 0521-56170 Website : www.npmch.net
Liason Office - Dhaka, 8/4-A (1st Floor),
Block- B, Lalmatia, Dhaka- 1207.
Tel- 02-9119091, Fax- 02-8126914
E-mail- chairman.npmch52@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত
নর্দান ইন্‌স্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স (এনআইএসএস)
নর্দান (প্রাঃ) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
মেডিকেল পূর্ব এলাকা, ধাপ, রংপুর।
মোবাইল নং ০১৭৪৭৪৮৩৯৬৮
E-mail : ninsr.bd@gmail.com

মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্পোরেট ব্যাংকিং

সময়ের সাথে দেশের **অর্থনীতিকে**
আরো সুদৃঢ় করতে
আমাদের প্রচেষ্টা সবসময়
ছিল, আছে এবং থাকবে...

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি

প্রধান কার্যালয়ঃ ৬১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫৯৩৩৩, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬১২১৩

www.mblbd.com

২০১৫ সাল জনতা ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের এক অনন্য সফলতার বছর

আপনি কি জানেন ?

- এখন হতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ৫০৩ টি শাখা থেকে অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।
- আজই জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন সেবা গ্রহন করুন।
- অনলাইন শাখার তালিকা http://jb.com.bd/jb/about_us/online_branches লিংকে পাওয়া যাবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

E-mail: dgmit@janatabank-bd.com website: www.janatabank-bd.com

Woman's World
COSMETICS
NH
69
Debut Fragrance by
Nasir Hossain
EAU DE PARFUM
100ml
THE DEBUT FRAGRANCE
FOR MEN

- আধুনিক প্যাকেজিং
- স্বদেশে বিদ্যমানের সিমেন্ট
- স্বয়ংক্রিয় ভাবে মান নিয়ন্ত্রণ

যুগ যুগ ধরে নির্মাণে স্থায়ী নির্ভরতা...

তাজমহল ব্র্যান্ড

মোস্তফা হাকিম সিমেন্ট

আলহাজ্ব মোস্তফা হাকিম সিমেন্ট ইন্ড্রাষ্টিজ লিঃ

হেড অফিসঃ ২১৮ দেওয়ানহাট, ডি.টি রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৮৮-০৩১-৭২০২২৮, ৭১০৬১০
ফ্যাক্টিরীঃ ছোট কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

UKAS ISO 9001:2000 সনদ প্রাপ্ত

ক্যাপিটাল জেনারেল হসপিটাল লিঃ

১০৮ আর.এম দাস রোড, লোহারপুর, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০। ফোন -৭১১৩৯২৮, ৭১১৩৯২৭

হার্ট এটাক প্রতিরোধ কর্মসূচী

হার্ট এটাক প্রতিরোধ ক্লিনিক

(উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিকস, স্থূলতা ও ধুমপানসহ এটাকের ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়)
(রবিবার সকাল ১১টা-দুপুর ১টা)

ফ্রি পরামর্শ
কর্মসূচী পরিচালক
ডাঃ মোঃ শফিউল আলম
এমডি, পিএইচডি,এমপিএইচ, সিসিডি, সিসিসিভিডি

COUNTER FOTO
A Center for Communication

পক্ষ থেকে

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টকে

চতুর্থকেন্দ্রীয় সম্মেলনের

শুভেচ্ছা